শব্দদ্বীপ

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৮

https://www.shabdodweep.co.in

প্রচ্ছদ সৌজন্যে

পেক্সেলস

শব্দদ্বীপ

ওয়েব ম্যাগাজিন

সম্পাদনার দায়িত্বে

মৌমিতা দত্ত
প্রিয়াঙ্কা ভুঁইয়া

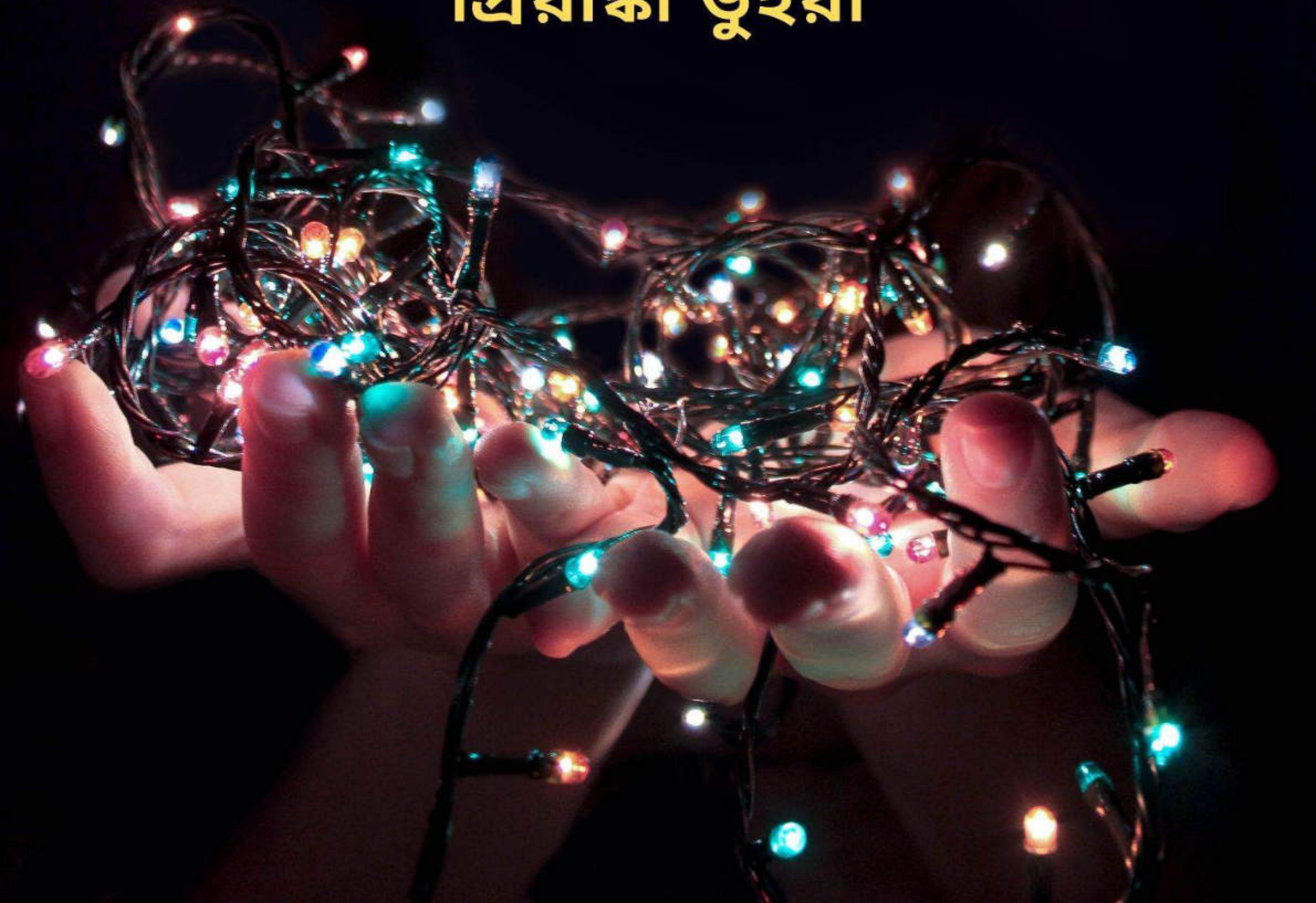

পিডিএফ বইয়ের রূপসজ্জার
দায়িত্বে

সুপম রায়

শব্দদ্বীপের সকল লেখক / শিল্পীদের
প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
সকলে শব্দদ্বীপের পাশে থাকুন
এবং
শব্দদ্বীপকে
সকলের কাছে পৌঁছে দিন।

শব্দদ্বীপ

কবিতা / গল্প / প্রবন্ধ / অনুবাদ / আঁকা / হাতের কাজ / ভ্রমণ কাহিনী / ফটোগ্রাফি

Shabdodweep

shabdodweep@gmail.com

প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়

১ম ইভেন্ট শব্দদ্বীপ সংখ্যা	শব্দদ্বীপ ১ম ইভেন্ট সময় ৫ – ৯ তারিখ পর্যন্ত
৭ তারিখ শব্দদ্বীপ সংখ্যা	শব্দদ্বীপ ৭ তারিখ ১ম সংখ্যা
২১ তারিখ শব্দদ্বীপ সংখ্যা	শব্দদ্বীপ ২১ তারিখ ২য় সংখ্যা
২য় ইভেন্ট শব্দদ্বীপ সংখ্যা	শব্দদ্বীপ ২য় ইভেন্ট সময় ২২ – ২৬ তারিখ পর্যন্ত

Website Link :

https://www.shabdodweep.co.in

লেখক সূচীপত্র

(১) চুনীলাল দেবনাথ
(২) রঞ্জন ভাওয়াল
(৩) সুব্রত চৌধুরী
(৪) আভা সরকার মন্ডল
(৫) রবীন্দ্র মণ্ডল
(৬) সুমিতা মুখার্জ্জী

(৭) ত্রিভুবনজিৎ মুখার্জী
(৮) আশীষ গুহ
(৯) পরাগ ভট্টাচার্য্য
(১০) মদন মোহন ঘোড়ই
(১১) দালান জাহান
(১২) শর্মিষ্ঠা ঘোষ
(১৩) বিশ্বজিৎ কর
(১৪) প্রিয়াঙ্কা মুখার্জী

লেখক সূচীপত্র

(১৫) দুর্গাদাস মিদ্যা

(১৬) সুমালিকা ভট্টাচার্য্য

(১৭) ইলা চক্রবর্তী

(১৮) কুহেলী দাশগুপ্ত

(১৯) অমিত চক্রবর্তী

(২০) প্রবোধ কুমার মৃধা

(২১) সুকন্যা সাহা

(২২) অতনু দাশ গুপ্ত

(২৩) সৌম্য ঘোষ

(২৪) বরুণ চন্দ্র পাল

(২৫) দিশানী বোস

(২৬) শম্পা সাহা

(২৭) আবীর মহাপাত্র

(২৮) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

লেখক সূচীপত্র

(২৯) বন্যা ব্যানার্জী

(৩০) প্রসাদ সিং

(৩১) সুজিত বসু

(৩২) প্রবীর রঞ্জন মণ্ডল

(৩৩) নিত্য রঞ্জন মণ্ডল

(৩৪) সুব্রত নন্দী

(৩৫) শংকর ব্রহ্ম

(৩৬) সোমনাথ সরকার (উদয়)

(৩৭) বিপ্লব সরকার

(৩৮) অমল ভৌমিক

(৩৯) দোয়েল পাল

(৪০) শান্তি দাস

(৪১) ইন্দ্রাণী সমাদ্দার

(৪২) ডাঃ অনিরুদ্ধ পাল

লেখক সূচীপত্র

(৪৩) শীতল চট্টোপাধ্যায়

(৪৪) অন্নপূর্ণা ঠাকুর চক্রবর্তী

(৪৫) সুচন্দ্রা বসু

(৪৬) অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

(৪৭) ইন্দ্রাণী সরকার

(৪৮) জগদ্বন্ধু হালদার

(৪৯) মহাজিস মণ্ডল

(৫০) বারিদ বরন গুপ্ত

(৫১) মহুয়া ব্যানার্জী

(৫২) অজয় শীট

(৫৩) সুনন্দ মন্ডল

(৫৪) সুভাষ কর

(৫৫) নিতাই দাস

(৫৬) বিধান চন্দ্র নস্কর

লেখক সূচীপত্র

(৫৭) সুভাষ নারায়ণ বসু
(৫৮) মুকুল সরকার
(৫৯) পাপিয়া গাঙ্গুলি
(৬০) শর্মিষ্ঠা বসু তরফদার
(৬১) শম্পা ঘোষ
(৬২) বদরুদ্দোজা শেখু
(৬৩) নিমাই জানা
(৬৪) মানসী গাঙ্গুলী
(৬৫) ডঃ রমলা মুখার্জী
(৬৬) প্রদীপ কুমার দে
(৬৭) রূপশঙ্কর আচার্য্য
(৬৮) শেখ আব্বাস উদ্দিন
(৬৯) সুজন দাশ
(৭০) আবদুস সালাম

লেখক সূচীপত্র

(৭১) অদিতি ঘোষদস্তিদার

(৭২ দেবানন্দ দে

(৭৩) অনিন্দ্য ঘোষ

(৭৪) রূপক ভন্জ

(৭৫) অঙ্কুরিতা দে

(৭৬) সঞ্জীবন সিংহ মহাপাত্র

(৭৭) দীপঙ্কর সাহা

(৭৮) শুভ্রা ভট্টাচার্য

(৭৯) পিকু হালদার

(৮০) শুভ্রা আচার্য্য

(৮১) গৌতম তালুকদার

(৮২) পিয়ালী গাঙ্গুলী

(৮৩) মৌমিতা দত্ত

(৮৪) প্রিয়াঙ্কা ভুঁইয়া

(৮৫) সৌমেন পাল

শব্দদ্বীপের সকল বন্ধুদের

শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

রিমঝিমরা অতীত

- চুনীলাল দেবনাথ

আঁধার আরো আধাঁর চাই
তবে একটু অক্সিজেন দিও
যদি তোমার বিশ্বাসের গভীরে
মিশে থাকে একটা রুপোলী রেখা
অথচ এতো কাল হাঁটলাম
সেই প্রভাটা আজও পেলাম না
প্রতিদিন দেখি বাগানের
ফুলগুলো শুকিয়ে যায়
তবে চারা গাছ হয় না
একদম হাইব্রিড ফুল
ফলের দফারফা
তবুও ভালোবাসি
আবার আড়ালে চোখ রাঙা করি
এখন রিমঝিম বৃষ্টিরা কথা বলে না
হয় মরুভূমি না হয় বন্যা ।

রঙ্গিন জল

- রঞ্জন ভাওয়াল

এক বোতলে আছে বিশুদ্ধ জল
যে জল দেহের তৃষ্ণা মেটায়,
আরেক বোতলে আছে রঙ্গিন জল
সেই জল প্রেমের বিষাদ ঘটায়।

যে রঙ্গিন জলে তোকে ভুলতে চাই
সেই জলে দেখি তোর মুখ,
এই ঔষধে রোগ সারেনা
উপরন্তু বাড়ায় মনে দুখ।

কি আছে এই রঙ্গিন জলে
আমার জানা নেই,
চুমুক দিলে কিভাবে ওঠে
এক সমুদ্র ঢেউ।

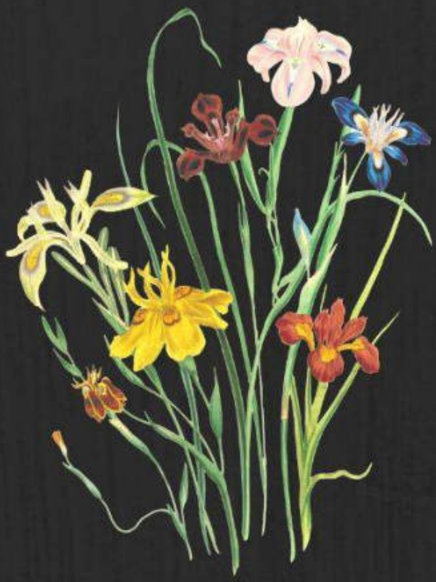

রক্ত দিয়ে কি রক্ত ধোয়া যায় ?
নেশায় কাটে কি নেশা ?
তুই যে আমার প্রেমের পিপাসা
কেমনে মেটাই তৃষা।

বোবা

- রঞ্জন ভাওয়াল

আমি বলতে পারি না কথা
অতি সাদাসিধে, নয়তো বুদ্ধিমান,
তাই প্রতি পদে হেয় হয়ে
সহ্য করি অপমান।

মুখে আমার প্রকাশ পায় না
তবুও আছে প্রতিবাদের ভাষা
লিখে আমি প্রকাশ করি
কলম আমার প্রধান ভরসা।

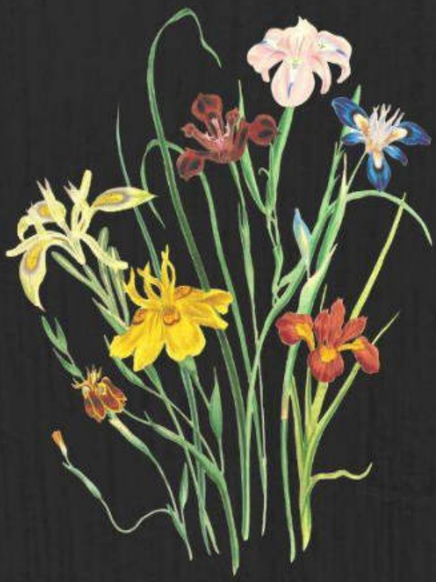

ওদের ভাষা বুঝিয়ে দেয়
ওরা কত ক্ষমতাবান!
অসহ্য যন্ত্রণায় বলতে পারি না
দিয়ে থাকি প্রাণ বলিদান।

জলসা

- সুব্রত চৌধুরী

বনের গাধার গলা সাধা
শুনে শেয়াল মামা,
গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে
হুক্কা হুয়া গা মা।

বানর নাচে তিড়িং বিড়িং
বনের গাছে গাছে,
নদীর জলে ঘাঁইটি মারে
কাতলা, বোয়াল মাছে।

সিংহ মামা নাচায় কেশর
হাতি নাচে শুঁড়ে,
ভোঁদর নাচে তা তা থই থই
একটুখানি দূরে।

ময়ূর নাচে পেখম মেলে
মেঘ গুড় গুড় ডাকে,
হরিণ ছানা রং তুলিতে
তারই ছবি আঁকে।

দোয়েল পাখির সুরে সুরে
গোখরো সাপে নাচে,
হালুম হালুম ডাকে বাঘে
সুখের দিনের আঁচে।

ভুলতে চেয়ে

- আভা সরকার মন্ডল

কিছু চলে যাওয়া সময়
বিষাদ বিছিয়ে দেয় প্রিয়জনের বুকে
ভূত-ভবিষ্যৎ সাথে নিয়ে চলে যান তাঁরা
পড়ে থাকে বর্তমান, স্মৃতিমাখা যাপন চিত্র হাতে।

নিয়মগুলো অমোঘ, তাই চোখ মেলে দেখা ছাড়া
কারো কিছু করারও থাকে না ,
সময় পেরিয়ে, নিয়ম মতোই সবকিছু একদিন
ভুলেও যায় সকলে ----

শুধু প্রিয়জন-ই পায় অতীতের গন্ধ,
উঠোন থেকে বারান্দা হয়ে, যা ওঠে আসে ঘরে,
প্রানপণে ভুলতে চেয়ে ও তাঁকে
আরো বেশি করে তাই ---- বারে বারে মনে পড়ে !

নোনতা

- আভা সরকার মন্ডল

সমুদ্র আমার অচেনা নয়---
পৃথিবীতে পা রাখতেই,প্রথম কান্নার সাক্ষী হতে
চোখ জুড়ে আসন পেতেছিল সে
কিন্তু জলতেষ্টা মেটাতে না পেরে
ফিরে গেছে তার ধারা---

যাবার আগে
মৃত্যুকে পাশে রেখেই শিখিয়ে দিয়ে গেছে বাঁচা
--- বুকে রেখে গেছে বিচ্ছেদ ব্যথার ঢল--
তখন থেকেই জানি, আমার---
নোনতা চোখের জল !

সুন্দরী কোলকাতায়

- রবীন্দ্র মণ্ডল

তুমি তো সেই সুন্দরী কোলকাতা
যাকে দেখার জন্য বিদেশ থেকে মানুষ আসত, ভিড় জমাতো ।
অনেকেই আবার প্রেমে পড়ে যেতো তোমাকে দেখেই
তুমি শুধু সুন্দরী বলে ।
এখন কেনো আসেনা সেই মানুষের মোতো মানুষ গুলো ?
যারা তোমার যৌবনের সুন্দরী রূপ দর্শন করতে চায় ।
তারা আর আসেনা
কারণ তুমি যে আছো ময়লা আবর্জনাময় পোশাকে ।
ফুটপাথের ভিখারিনি পাগলের মতো বসে ।
তোমার কি বয়স হয়ে গেছে ?
তুমি কি বৃদ্ধা হয়ে গেছো ?
কোলকাতা বাসিন্দা তো ভাবেনি
তুমি বৃদ্ধা হয়ে যাবে ।
তারাতো জানতো তুমি চির কুমারী, চির যৌবনের সুন্দরী ।
তাহলে কেনো এই বেশে বসে আছো ?
তারাতো এই বেশে দেখতে চায়নি ।
এখন তো সুন্দরী হওয়ার জন্য
কত উন্নত সাবান, ক্রিম পাওয়া গেছে ।
কিন্তু তোমাকে কি সুন্দরী করার মতো কিছু নেই?
যা থেকে তুমি আবার সেই যৌবনের সুন্দরী হয়ে উঠবে ।

নদীর ভালোবাসা

- রবীন্দ্র মণ্ডল

দু'জনে বসে আছি এক অনন্ত নদী কূলে ।
দু'জনে হয়ে আছি গল্পে মাতাল ।
কুচি পাথর ছুঁড়ি নদীর জলে ।
দু'জনের মধ্যে আবার তর্কের আসর বসে ।
দেব না জিৎ তা থেকে কোয়েল না কৌশানি ।
কিছু সময় থেমে থাকলেও তর্ক থামে না
রবীন্দ্র-শরৎ হয়ে তর্ক চলে যায় সুনীল-জয়ে ।
তর্কের মাঝে হঠাৎ দেখি নদীর গড়াগড়ি ।
পাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে লুটিয়ে পড়ে পায়ের নীচে ।
ফেনা গুলো খিল খিল করে হাসে ।
যেন বঙ্গবধূর বাসর ঘরের স্বাদ পেয়েছে ।
আমি বললাম আমার তর্কের সঙ্গীকে
দেখোনা নদী আজ কেমন অসহায় হয়ে
তোমার দিকে তাকিয়ে আছে ।
গড়াগড়ি খাচ্ছে কিছু বলবে বলে ।
মনে হয় তোমাকে ভালোবাসার কথাই বলবে ।
তুমি নদীকে ভালোবাসো না ?
আমাকে হারানোর ভয় নেই ।
আমি আছি তোমার কাছে তোমার পাশে ।

জ্ঞাতার্থে

- সুমিতা মুখার্জ্জী

দুতাড়া থাকলে
মঞ্চ বদলায় কুশলী

যৌবনের যাত্রা পালায়
তাপমাত্রা বাড়লে
তুমি ভাবো স্বর্গদ্বার

অথচ আগুন উত্তাপে
খাক হয়ে যাওয়া অষ্টাদশীও
পাষাণ অহল্যা!

একটা চেনা গল্প

- সুমিতা মুখার্জ্জী

সদর্থক শব্দ গুলোর ড্রিবল,
নস্টালজিক ম্যান্ডোলিনের তার
মাথার ভেতর সূর্য, বুকে বৃষ্টি
পৃথিবীটা তোমার না আমার?

বাংলার বব ডিলানে সুফিবাদ
গান ওয়ালা, তুমি গান ছাড়লে কেন?
তোমার কথায় গোপন সূত্র পাওয়া
দেখতে হবে হারিয়ে ফেলি না যেন।

হঠাৎ আসা, হঠাৎ উড়ে যাওয়া
হঠাৎ কেন একলব্য সাজে!
সিজোফ্রেনিয়া না অন্যকিছু
ভাবনাটা কি বড্ড আজেবাজে?

ট্রপোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে অন্য কোথাও
চলো একটু দু'জন মিলে বসি,,
বান্ধবহীন ফিলামেন্টের দেশও
মোছার জন্য রবার দিয়ে ঘষি।

ইলিউশানে দ্যোতক একটানা
এটাই যদি ইনফেচুয়েশন হয়,
তুমি আমায় সত্যি ভুলে গেছো
কখনই এটা মিথ্যে কথা নয়!

দুই বান্ধবী

- ত্রিভুবনজিৎ মুখার্জী

লকডাউনে বাচ্চাদের সব চেয়ে বেশি কষ্ট । বাড়ির বাইরে খেলতে যেতে পারেনা ঘরে বন্দী, স্কুল বন্ধ। অনলাইনে ক্লাস।
অদিতি আর ঋদ্ধিমা। আমার ফ্ল্যাটের সামনে থাকে অদিতি আর পাশে থাকে ঋদ্ধিমা। দুপুরে খাওয়ার পর দুজনে জানলায় দাঁড়িয়ে একে অপরকে ডাকে। দুই বান্ধবী যখন এসে ব্যালকনিতে গল্প করে আমার খুব ভালো লাগে ওদের কথা শুনতে। অদিতি বাঙ্গালি ঋদ্ধিমা বিহারী ওদের কমন ভাষা হিন্দি তাই ওরা হিন্দিতেই কথা বলে।

অদিতি বলে, "আজ মেরে পাপা নে মেরে লিয়ে এক ডল লাই । ইয়ে দেখ।"
ঋদ্ধিমা বলে, "মেরে পাপা ভি মেরে লিয়ে এক টকিং ডল লাই । ও বোলতি হ্যায়।"
অদিতি বলে, "শুনা ক্যায়শে বোলতি হ্যায়।"
ঋদ্ধিমা পুতুলের পেছনে একটা বোতাম টেপাতে পতুলটি বলতে শুরু করে, "হাই ঋদ্ধিমা। গুড় মর্নিং। ওয়ের ইওর মাস্ক এন্ড স্টে সেফ।"

অদিতি ওর মাকে বলে, "আমার এরকম একটা পুতুল চাই ।"
অদিতির মা বলেন, "বন্ধুর পুতুল দেখে খুশি হতে হয় হিংসে করতে নেই মা।"
- আমি তো হিংসে করছি না! আমি এরকম একটা পুতুল চাইছি ।

ঠিক আছে আমি তোমার বাবাকে বলে কিনে দেব কেমন, এখন পড়াশুনো কর।
'আচ্ছা' - বলে চলে যায় অদিতি।
অদিতি পড়াশুনোতে ভালো। ঋদ্ধিমা একটু মাটো।
ঋদ্ধিমা সারাক্ষণ ওই পুতুল নিয়ে খেলা করে কিন্তু অদিতি পরীক্ষার পড়া করে।
দুজনের ফাইনাল পরীক্ষার ফল বেরুলো অদিতি ফাস্ট ঋদ্ধিমা অংকে ফেল।
ঋদ্ধিমা আর আসেনা ব্যালকনিতে। অদিতি ডাকলেও না।
ঋদ্ধিমার মা দুপুরে মেয়েকে অঙ্ক করান।
অদিতি তার পুতুল নিয়ে দুপুরে একা একা জানলার ধারে খেলে।
বন্ধু না থাকতে মেয়েটা মন মরা।
আমি ভাবি, আহারে মেয়েটার বন্ধু নেই। একা একা খেলছে। খুব মায়া হয়।

খবরটা ছিল....

- আশীষ গুহ

হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি, হঠাৎ একটা গাড়ি আমাদের ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি একটা বাইককে ধাক্কা মারলো। ছিটকে পড়লো বাইক চালক। দুদিকের গাড়ি সব থেমে গেল। একজন হেলমেট পরা মহিলা ছুটে এসে রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকা বাইক চালককে টেনে সোজা করে চোখেমুখে জল দিতে লাগলো। এরই মধ্যে ব্যস্ত নাগরিকরা একে একে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগলো নিজেদের গন্তব্যে। সবাই ব্যস্ত, তাদের কর্মস্থলে পৌঁছতে হবে যে সঠিক সময়ে!

আমি গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে ট্রাফিক গার্ডে খবর দিলাম। পুলিশ তৎপরতার সাথে এম্বুলেন্স ডেকে আনলো। আহত বাইক চালকের সাথে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন হাসপাতালে।

পরেরদিন একটা দৈনিক পত্রিকার এককোনে ছোট্ট করে ছাপা একটা খবরে চোখ আটকে গেল। খবরটা ছিল...

"গতকাল ডানকুনির কাছে হাইওয়েতে এক বাইক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে এক পথচারী মহিলার সহায়তায় এবং পুলিশি তৎপরতায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ফলে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ওই মহিলা একজন অ্যাসিড-আক্রান্ত। একজন পুরুষের অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি আজ এক বিকৃত মুখমণ্ডলের অধিকারিণী। তবুও এই পথ দুর্ঘটনায় যখন একজন মানুষও আহত ব্যক্তিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি, তখন তিনি একলাই এগিয়ে আসেন। এমনকি ভদ্রমহিলার সাথে যে পুরুষ সহকর্মীটি ছিল, সেও তার অফিস চলে যায়।

আসলে মেয়েরা তো মায়ের জাত, তাই নিজের যন্ত্রনা ভুলেও বারবার এগিয়ে আসে অসহায় মানুষের সেবায়"।

সপ্তমীর চিঠি

- পরাগ ভট্টাচার্য্য

সপ্তমীর ফোনটা আসার পর, কিছুটা বিচলিত
এতগুলো দিন, হঠাৎ মনে পড়ল?
ও কিন্তু ছিল স্বাভাবিক, যেন প্রতিদিন কথা হয়
আমার মনেই যত উচাটন!
কেন এত ভাবান্তর, আমার মনেই?
উত্তর পাচ্ছি না, মনে পড়ছে সেই দিনগুলো
আবার স্মৃতির পাতায় ফিরে এল;

সে পুজোয় আসছে, যেমন অনেকে আসে বিদেশ থেকে
কোনো অবাক হবার নেই, আমার আছে!
সে আসতে বলেছে আমাদের প্রথম দেখার জায়গায়
সপ্তমীর দিন সকাল নটায় ,
এতেও আমি ততটা আশ্চর্য নই, কারণ সেই জায়গাটা ,
অবাক লাগছে একটাই কারণে,
এতদিন পরেও কিছু কথা তার বাকি রয়ে গেছে!
কিন্তু আমার তো কিছু চাওয়ার নেই
স্মৃতি সতত সুখের হয় না, যন্ত্রনাও দেয়,
বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছি
বুঝতে পারলাম, বিবর্তনই এর কারণ ,

তৃষ্ণার্ত এক চাতকের মতো গিয়েছিলাম
সপ্তমীর চিঠি আমার হাতে, দুহাতের অঞ্জলি, বিদায় নিতে।

পুজোর গন্ধ

- পরাগ ভট্টাচার্য্য

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, পুজোর গন্ধটা!
গত বছর থেকেই পাচ্ছি না,
কোনো অসুর নাকি সব গন্ধ শুষে নিয়েছে,
অনেকে তো কোনো গন্ধই পায় না!
আমি শুধু এই পুজো পুজো গন্ধটা থেকে বিরত,
ভেবেছিলাম, এবছর আবার ফিরে পাব
আশা ছিল, কিন্তু সে হবার নয়!
শিউলি ফুটেছে, দেখেছি সামনের পরিপূর্ণ গাছটিতে,
দূরের মাঠটায় বড় একটা কমপ্লেক্স উঠছে,
ওই জায়গা জুড়ে গতবার কাশবন দেখেছিলাম
এবারেও আছে আনাচে কানাচে
হালকা বাতাসের ছোঁয়ায় দুলছে, লজ্জায়!
দূর্বাঘাস উঠেছে সবুজ গালিচার মতো মাঠ জুড়ে,
নতুন শিশিরের ছোঁয়ায় কেপে উঠবে, জানি,
মুক্তো পরানো আংটিটা ঝলমল করে উঠবে
কুয়াশা পেরিয়ে আসা সূর্যের প্রথম আলোয়,
তবুও কি পুজোর আবেশে মাততে পারব ?
পাব কি সেই আনন্দ, যেটা পুজোর গন্ধ পেলে হয়!
ক্যালেন্ডারের দিনগুলো যেন চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে,
জানা নেই আনন্দের সবুজ বাতিটি জ্বলবে কিনা।

ট্রাজেডি

- মদন মোহন ঘোড়ই

ছিন্ন পাতার কুটির সাজাই দুঃখ দ্বীপের সুদূরপারে
মুঠো মুঠো অশ্রুকণা স্ফটিকাকারে সংরচনা
বিকীর্ণ করেছে মোরে সহিষ্ণুতার অলংকারে।
দীপ্তিহীন,কীর্তিহীন,আমি অতিশয় দীন
রজনীগন্ধা ও নই,কৃষ্ণচূড়া ও নই
পথের দুধারে ফোটা নাম অর্বাচীন ।
জয়মাল্য,বীজয়টীকা ওসব আমার জন্য নয়
ক্লান্তির পথে পথে,স্বপ্নসিন্ধু আঁখি হতে
দুঃস্বপ্নের সাথে ঘটে আপনার পরিচয় ।
যশ,খ্যাতি জমা থাক্ ভবিষ্যতের হিম সরোবরে
আমি থাকি আঁধারে,আকণ্ঠ পঙ্ক মাঝারে
মোর বুকে জন্ম নেয় শতদল বাহারে।
এতো মোর প্রত্যাশিত নীরব অহংকার
কাগজের ফুল দিয়ে,আমার সুগন্ধি নিয়ে
রচিয়াছ ফুলমালা দ্যুতি- মনিহার।
অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা সাজাই যতনে
খণ্ড খণ্ড জড়ো করি,তারপরে হর্ষ আবরি
একদিন ঝরে যাব কামিনীর গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে। ।

সমসাময়িক

- মদন মোহন ঘোড়ই

অদ্ভুত সময় এসেছে এই সুশোভন পৃথিবীর বুকে
গাছের ঘাতক খোঁজে গাছের বিশ্বাসী ছায়া
শয়তান খুঁজে ফিরে বিকচ ফুলের ভালবাসা
কোন এক যাদুকরী-খেলায় মেতেছে একদল
সচতুর ঝানু শেয়াল
খেলার নামে ছল করে খামচে ধরে
আগামীর সত্ত্বাকে,বেদনার তীক্ষ্ণ নখে।
টোপ দিয়ে ধরে নেয় নরম লতার মত
সরল মনের আবেগ,অতর্কিত নিশানায়।
হননের বাঁকা ছুরি লুকিয়ে রাখে
ভিমরূল মগজের বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের খাপে,
ফুল সহ তরু-মূল ছিঁড়ে গেছে গোপন ঘাতক।
ব্যাথার প্রবালদ্বীপে গড়ে উঠে নির্জন অধিবাস।
আর দেরী নয়,প্রথমে পোড়াই ভেতরের ভীরুতার পাপ
সুসংহত পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আছড়ে পড়ুক
দূষিত সাম্রাজ্যের বক্ষমাঝে,
বারুদের জমা গচ্ছিত যত শক্তি
বিস্ফোরণে কেঁপে উঠুক নৈরাজ্যর ধরাতলে।
হয় হোক্ জ্বলন্ত নাগাসাকি আর একবার ।

সাদা কবুতর

- দালান জাহান

গৃহ অন্ধ
তোমার প্রদীপ্ত চোখ খোলে
খালাস করো দিন
চারদিক স্তব্ধ শুষ্ক মলিন
বাঁশি বাজাও! বাজাও! নাগিন।

তোমার অপেক্ষায় নষ্ট করেছি
বহু জনম বহু ভ্রূণ
এবার এসো মেরুন রঙা লাক্ষ
ওজনহীন অক্ষরে হই খুন।

দুইয়ে-দুইয়ে উষ্ণ ছোঁয়ে আষ্টে পরস্পর
লোমকূপে চাষ করি সাদা কবুতর।

সন্ন্যাস

- দালান জাহান

কথা ছিলো বিশুদ্ধ বাতাসের দাবিতে
একদিন গলির মোড়ে মিছিল হবে
কার্নিশে হেডফোন ঝুলিয়ে
তুমি শুনবে অবাক রবীন্দ্রনাথ।

পাখি বিষয়ক কর্মশালায় যোগ দিতে
সমতলে নেমে আসবে সব পাহাড়ি মেয়েরা
কিন্তু আমার প্রেমিকারা বিশুদ্ধ হতে গিয়ে
প্রেমে পড়বে সন্ন্যাসীর।

সেই থেকে সন্ন্যাস আমি।

বিবাহ সমাচার (১৩)

- শর্মিষ্ঠা ঘোষ

সকলে যা দেখতে চায় তাইই দেখাই
কমফোর্ট জোনে রাখে যা আমাদের
ভুলেও খুলি না পাটি মোড়া বিষাদ
মেঘলা রং পেনসিলে আঁকা আমাদের দূর
মাঝখানে মাইল মাইল খানা খন্দ
মাঝখানে সাতরং ওঠাপড়ার দিন
যা দেখতে চায় তাইই দেখাই যুগের ওপার থেকে
তাইই দেখে সবাই যা আমাদের নয়
জানি না কতদিন জানি না কতদিন এভাবে
পেন্সিল এঁকে দেবে মৃতদের মুখ

বিবাহ সমাচার (১৪)

- শর্মিষ্ঠা ঘোষ

যত বদলাই মাপ মতো ঘের আর ঝুলে ততই বদলে যায় সব
তল পাই না ছুঁতে পারি না কার্বন বহুরূপী যেন
তবে কি জন্ম বৃথা যাবে তবে কি কর্ম বৃথা যাবে
তবে কি ডারউইন সত্য নয় কেবল পুনর্মূষিক ভবঃ
তারপর আসমান নেমে এসেছে ভুঁয়ে
পাতালের অন্ধকার একমুখী সিঁড়ি রৌরব বরাবর
টর্চের ব্যাটারি খুলে রাখা অন্য ব্যবহারে
আমি যত ডালে ডালে তত পাতা ভরে ওঠে
আমি যত আড়ে আড়ে ট্যারা সংসার
শেষ নেই শেষ নেই এর
আরো কত খেলাধূলো হবে
শেষ নেই শেষ নেই এর
লোকে তেড়ে গালাগালি দেবে
আমি বুঝি মরে যাব ভয়ে বুঝি রণে ভঙ্গ দেব
আমি বুঝি তাবিজ মাদুলি জল পড়া তেল পড়া খাব
আমি বুঝি বিস্ময়ে বিস্ময়ে ভুলে যাব মেরা নাম জোকার

https://www.shabdodweep.co.in

কবিতার আকাশ!

- বিশ্বজিৎ কর

কবিতার আকাশে তাকাই না,
অনেক দিন হল!
কেমন যেন অন্ধকারময়তা.......

ও পাড়ার নিধু খুড়ো আজ চলে গেলেন -
স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন,
কবিতাও লিখতেন.....
বৃদ্ধাশ্রম থেকে লাশ এখনও আসেনি!

কানকাটা, খুনি জগু আজ ছাড়া পেল...
সংশোধনাগার থেকে!
কত সম্বর্ধনা, কত ফুল...
জানা গেল, একটা সাহিত্য সভায় থাকবেন!

আকাশটা বড্ড অন্ধকার, কবিতার!

সাহসিনী

- প্রিয়াঙ্কা মুখার্জী

বারুদের মতো মেঘ গর্জন করছে
চারিদিকে কালো ধোঁয়া
সেই ধোঁয়ার মধ্যে তাকিয়ে
আমি দেখতে পাচ্ছি
বোরখা পরা এক নারীকে
সে আজ নেমেছে রাজপথে
সরিয়ে ফেলেছে তার কালো আবরণ
চিৎকার করে বলেছে-
হামে আজাদি চাহিয়ে
তার চিৎকার শোনেনি কেউ
শুনেছে বুলেটের শব্দ
আর বাতাসে পোড়া মাংসের গন্ধ!!

কবিতা

- প্রিয়াঙ্কা মুখার্জী

শব্দরা ঘোরে ফেরে মাথার চারপাশে
প্রতিটা শব্দ তোমার অলংকার
প্রতিমার মতো করে গড়তে থাকি
ভেঙে ফেলি
আবার গড়ি, আবার ভাঙি
নিজের ইচ্ছা-সুখে সাজাই
কবিতাকে নতুন রূপে আমি চাই।

সে কি ধরা দেবে আমার কাছে!

আত্মীয়তা

- দুর্গাদাস মিদ্যা

হারিয়ে যাওয়া কিছু স্মৃতি হেঁটে যায়
নিঃশব্দ পায়। চোখাচোখি হলে থমকে
দাঁড়ায়, তারপর সমান্তরাল হেঁটে যায়
নির্দ্বিধায়।
ছুঁড়ে ফেলা কিছু স্বপ্ন অতীতের জাল
বোনে আপন খেয়ালে। মা যখন ঘুঁটে
পেটাতো দেয়ালে ছিন্ন বসনে তখন
উঁকি দিতো যৌবন। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে
কোনো কথা না বলে জড়িয়ে ধরে আদরে
বুক খুলে মুখে দিতেন অমৃতের স্বাদ।

ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোয় চলতো দুঃখ
সুখের আলো ছায়া খেলা। তবু মনে হয়
ফেলে আসা সময় কিছুটা থেকে যায়
থেকে যায় ঘুর্ণিজলের মতো কিছু ক্ষত
ক্ষমাহীন আত্মীয়তায়।

স্মৃতি

- সুমালিকা ভট্টাচার্য্য

অপেক্ষায় থাকে সোমা, কখন দাদুর বাড়ি যাবে, যদিও ওদের বাড়িতে অনেক লোকজন, পিসি কাকা, ঠাকুর্দা ঠাকুমা। সবার আদরের সোমা, কিন্তু, এ বাড়িতে সবাই ওর চাইতে অনেক বড়, দাদুর বাড়ির মজাই আলাদা। দাদুরা ছয় ভাই একই বাড়িতে থাকেন। দাদুর বাবা নাকি জমিদার ছিলেন, বিশাল বাড়ি। সামনে বড় মাঠ, বাঁধানো উঠোন চারিদিকে ঘর। কতো গাছ, পুকুর, মন্দির। মামাতো ভাই বোন তো আছেই, এছাড়া সোমার চাইতে ছোট মামা মাসী দুজন আছে ওর দুষ্টুমির সঙ্গী। কোথাও বেড়াতে গেলে, একসাথে যাওয়া, অনুষ্ঠানে একসাথে খাওয়া দাওয়া, সে এক এলাহী কাণ্ড।ভাইফোঁটা, লক্ষ্মীপুজো, রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী, বিয়ে, পৈতে সব কিছুতেই মেতে থাকত এই বাড়ি। বিকেল বেলা, বড়ো থেকে ছোট বাড়ির সব মহিলারা বারান্দায় বসে গল্প। আরও কতো সুন্দর স্মৃতি আছে। আজ সবাই দূরে দূরে, দেশ বিদেশে ছড়িয়ে। দেখা হয় না বহুদিন। বিশাল বাড়ি আজও মহিমা, গৌরব ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে অনেকে। কেউ গেছে না ফেরার দেশে, কেউ বা দূর দেশে। সোমা নিজেও থাকে ভিন রাজ্যে। আজ বহুবছর যাওয়া হয় না সেখানে, কিন্ত সব সময় মনে পড়ে, এক সময় যে বাড়ির বারান্দা মেতে থাকত গান গল্পে, কোলাহলে, আজ সেখানে শুধুই প্রতীক্ষা, তবে, এবছর নাকি সব মামা মাসিরা একসাথে বাড়ি যাবে, লক্ষ্মী পুজো, ভাইফোঁটা নাকি হবে সেই আগের মতোই। কিন্তু তারপর ! হবে বাড়ি ভেঙে, ফ্ল্যাট গড়ার পরিকল্পনা। হারিয়ে যাবে, সব ঐতিহ্য গরিমা। নতুন প্রজন্ম খুঁজে পাবে না কোনো ইতিহাস। বাড়ির সঙ্গে ভেঙে পড়বে এই বাড়ির সব অহঙ্কার!

মন ব্যাকুল

- ইলা চক্রবর্তী

রাত জাগা তারাদের জমে থাকা ব্যথা সব,
অতীতের বঞ্চনা করে শুধু কলরব।

কিছু কথা কিছু গান যন্ত্রণা টান টান,
বুক ফাটা রোদনে যত মান অভিমান।

জীবনের মধুটুকু তিতকুটে লাগে তাই,
হাসি দিয়ে ঢেকে রাখা সুখ বলে যাই যাই।

দূর দূর বহু দূর মরীচিকা মনে হয়,
এই আছে এই নেই অশ্রুর ধারা বয়!

সুখ আর দুঃখ নয়তো বন্ধু,
তবু যেনো তালে তাল দিয়ে যায় সে শুধু!

তবুও গুছিয়ে কথা কয় দিব্বি!
সুখ বলে আমি আছি দুঃখে ভয় কী!

অতীতটা ভোলবার সাধ্য নেই তো!
যা গেছে যা আছে থাক তবে এই তো!

জীবনটা টান টান ঘুণ ধরা ভিতরে,
আলগোছে প্রাণ টুকু কেড়ে নেবে ঠিকরে!

যদি ভুলি দ্বন্দ্ব হয় নাকো মন্দ,
ধীরে ধীরে ফিরবে জীবনের ছন্দ।

সাময়িক চোখে জল করে শুধু টলমল
হারাবার কিছু নেই আসা যাওয়া চলা চল।

এমনি এক চাঁদনী রাতে

- ইলা চক্রবর্তী

আমার দেহটা ছিল,পাথরের কুণ্ডলীর ঘরে,,।
ইট বালি সিমেন্টের কারখানায়,,!
আমার আত্মা শরীর ছেড়েছিল সেই ক্ষণে,
আমি অনুভব করি-
তোমার সাথে হাঁটছি জোছনা ভরা রাতে!
পথ চলতে চলতে ছুঁয়ে ছিলে আমার নরম হাত খানি!
জোছনার মসৃন সাদা চাদরে ঢাকা দুটি অবুঝ মন!
বুনো ফুলের মধু তটে তখনও লেগেছিল পরাগ!
নদীর আরশিতে দুজনার স্বপ্ন জড়ানো নেশাতুর চোখ দেখি!
ইচ্ছে গুলো সর্পিল গতিতে মনের বাঁকে বাঁকে যেন নজর রেখেছে !
চাঁদের আলোয় উর্বশী রাত তীব্র মায়া ছড়ায়!
সেই রাত,,,
নদীর বুকে মিষ্টি আবেশে চাঁদ বুঝি কাটে আবেগের আঁচড়,
স্বপ্নের লাগামহীন ঘোড়া ছোটে উপোসী মনের
এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে !
বনের কোথাও যেন কোন পাখি ডানা ঝাপটায়,
জড়িয়ে রাখে সোহাগে তার সাথীরে,,,,
তুমি তখনো আমায় ছুঁয়ে,ছুঁয়ে ছিলে আমার আত্মা!
আমি নিজের অজান্তে কখন জানি না নিজেরে করেছি সমর্পণ,
ভালোবাসার মাদকতায় মন ময়ুরী যেনো পাখনা মেলেছে,
আকাশের তারাগুলি বলেছিলো , সাক্ষী দেবে।
তুমি তখনো আমার হাতটি ছুঁয়ে,
হেঁটে চলেছি অনন্ত পথ আমরা দুজন !

বেসুরো অসুর

- কুহেলী দাশগুপ্ত

সকালে শয্যা ত্যাগ করে মহাদেব ধ্যানে বসেছেন। প্রস্তর খন্ডের ওপর বাঘছাল নির্মিত আসনে অসীন। । এমন সময় "বোম ভোলে" বলে নন্দী এসে মহাদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ধ্যাণে মগ্ন দেবাদিদেব চোখ মেলে ধীরে ব্যাপার জানতে চায়লেন। "স্বয়ং লঙ্কেশ্বর এসেছেন। আপনার শরণার্থী প্রভু। খুব অস্থির হয়ে আছেন মনে হচ্ছে।" নন্দী বলল। মহাদেব সম্মতি জানালেন দেখা করবেন বলে।দশখানা মুন্ডু নিয়ে দশানন প্রভুর পায়ে হামলে পড়লেন। "এই বার প্রভু দশেরা তে রাবণ বধ বন্ধ করুন। এই মহামারী কালে মাস্ক পড়ে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই চিতার ধোঁয়ায় বায়ু দূষণ হচ্ছে। সেই ঠ্যালায় হেঁচে মরে যাচ্ছি প্রভু। দশখানা মাথার ঝক্কিতো কম নয়!"মহাদেব গম্ভীর হয়ে শুনে বললেন,"দ্যাখ রাবু , সবখানে মাথাগুলি ডিসপ্লে করবি না। অনেকদিন বলেছি, ফোল্ড করে রাখবি ফোল্ডিং ছাতার মতো। আর দশেরাতে রাবণ বধ আমার হাতে নেই রে। কি কুক্ষণে জানকী কে কিডন্যাপ করেছিলি!মতিভ্রম তোর। রাম ভক্তরা এখন উল্লাস ভরে সেই দিন উৎযাপন করে। তুই বরং দহনকালে হেলমেট পড়ে নিস। অন্ততঃ মাথাগুলি রক্ষা পাবে। " মহাদেবের নিদান শুনে মন মরা রাবন ফিরে চলে।

এদিকে মহিষাসুর পার্বতীর পায়ে লুটিয়ে কাঁদছে।"ক্ষ্যামা দাও মা ঠাকরেন। এই বার আমি বিশ্রাম নিই। মর্ত্যে করোনাসুর, কর্কটাসুর, ডেঙ্গীসুর, ডেল্টাসুরেরা সব বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাউকে পায়ের তলায় নাওনা কেনে?প্রতিবছর ত্রিশূলের খোঁচা খেয়ে রিব গুলি ঝরঝরে হয়ে গ্যাছে।"দেবী গর্জে ওঠেন,"জ্ঞান দিবিনা মইষ্যা। ওইসব ভ্যারাইটির দানবদের মানুষই বধ করবে। আমরা যাব তাদের মনোবল জাগাতে। তোকে নিয়ে তো অসুর বধের ডেমো দেয়াবো। এই ভাগ্যি ক'জনার হয়রে? ভেউ ভেউ না করে বুকের পাটা শক্ত কর। আর তো ক'টা দিন।" মহিষাসুর চোখ মুছে মনকে বোঝাতে থাকে।

বালুচর থেকে

- অমিত চক্রবর্তী

অনন্ত নীল তোয়ালে বা বালুচর থেকে সমুদ্রের স্বপ্ন –

এখানে বৃষ্টি হয় না এই মাসে, নিঃশ্বাসে যা কিছু জলবাষ্প
জমা, আমি বুঝতে পারছি আমাদের সম্পর্ক এখন
নড়বড়ে, বিচ্যুত হয়তো, তোমাকে খুঁজিনি আমি
সাতমাস, অনেকদিন। তুমিও কি জুপিটার,
ঠান্ডা রাজহংস,
ছলনায় সুর্য থেকে দূরে অথচ ঘূর্ণির
রেডস্পট নিয়ে অপেক্ষায় লেডার? তবে নেমে
এসো চরকি পাকে, আমি যদি প্রলুব্ধ হই, আপ্লুত হই,
যদি বলি কাছে দাঁড়ালেই বিমোহিত হব,
নকল, কপট হংসধ্বনি রাগে?

শোনো জিউস, আমি কৃত্তিম পুল চাই না, নীল অথবা নিশ্চল
মিশিগান লেক, আমাকে স্বপ্ন দেখাও ঝিলিমিলি
অতলান্ত –
স্বেদ নিয়ে, শরীর নিয়ে, বিকিনি ঢাকা জরুল নিয়ে
এই আমি পাড়ি দিলাম, এই আমি সাগরের স্বপ্নে একদা
এবং পুনরায় ভাঙচুর।

পাতা ওল্টানো খোলা বইয়ের মতন

- অমিত চক্রবর্তী

এবার তাদের দেখা হয় সোনারপুরে, কোনো এক
এলো ছাদের মাথায়। একতলা বাড়ির সব ছন্দ,
সব ঈর্ষা নিয়ে
হাজির সেই বর্ধিষ্ণু ছাদ –
লাউগাছ জড়িয়ে মাথায়, জটা রুক্ষ,
ফাটলে যজ্ঞিডুমুর, কার্নিশে পাখি,
কৌতূহলী পরচর্চা।

মেয়েটি হাসে, হাত বাড়ায়। ব্যবধানে তাও,
একটা ফল্টলাইন, তোমাদের দেশে
শুনি ন্যাড়াছাদ নেই, ত্রিকোণ গঠন সব, ঢালু,
যাতে বরফ গড়িয়ে পড়ে জমা না থেকে?
ছেলেটি সন্ত্রস্ত এখন, কত কিছু অ–গল্প
তার অতীতে,
সঙ্গোপনে ঢাকা সেই অধ্যায় –
অথচ দ্যাখো
এই মেধাবী, গভীরচোখ মেয়ে
তাকে নিশ্চয়ই পড়ে নেবে, আদ্যোপান্ত
পাতা ওল্টানো, খোলা বইয়ের মতন ।

স্বগৃহ-বৃদ্ধাশ্রম

- প্রবোধ কুমার মৃধা

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ও বিছানা ছাড়তে অনেক বেলা হয়ে গেল কুঞ্জবাবুর। স্ত্রী অশ্রুকণা এসে বার বার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন ।তাই সন্তর্পণে নেমে মেঝেতে পাতা চেয়ারে বসে নিঃশব্দে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। মনটা ভারাক্রান্ত। সারা রাত স্বপ্ন দেখেছেন, তাও শুধু মরা মানুষদের স্বপ্ন, মরা লোককে স্বপ্নে দেখা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে কে জানে! আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে।

কুঞ্জবাবুর বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি; শরীরের অবস্থা এখন একরকম তো তখন একরকম। ওষুধের ওপর বেঁচে থাকা।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। এই টাইমে ঝুমা আসে। পরিচারিকা। সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম ছাড়া দু-বেলার রান্না ওই-ই করে। কোন কারণে একদিন কামাই করলে এ-সংসার অচল। মাত্র দুটি প্রাণী, অশীতিপর কর্তা আর গিন্নি। দুজনেই অর্ধ অচল।

ভরা যৌবনে কুঞ্জবাবুর ভরা সংসারের স্মৃতি আজ স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। কেন্দ্রিয় সরকারের অধীনে অফিসার মর্যাদায় সারভিস করেছেন। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে জামাই কাজের সুবাদে দিল্লি বাসী। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে অভ্র সপরিবারে থাকে চেন্নাই ।মাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে তার, তবে মা যেতে রাজি হচ্ছেন না। এই শেষ বয়সে গৃহকাতর মানুষটাকে নিঃসঙ্গ রেখে বা বৃদ্ধাশ্রমে তুলে দিয়ে ছেলের সংসারে ওঠার পক্ষে সায় নেই অশ্রুকণার। অগত্যা দুজনেই পড়ে আছেন কলকাতার বাসায়।

দোকান বাজার ওষুধপত্র সব হয় ফোনে। পাশাপাশি এক ভাইপো থাকে। জরুরি প্রয়োজনে তাকেই তলব করতে হয়।ছেলেটি ভালো। হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে ও দিনান্তে দু-একবার জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমার খোঁজ খবর রাখে সে ।গতবছর পুজোর সময় দিন চারেকের জন্য এসেছিল অভ্র ছেলে বৌকে সঙ্গে নিয়ে। নাতি উৎসবের বয়স এখন ছ'বছর ।কলকাতা আর ঠাকুমা তার খুব ভালো লেগেছিল। এবছর আর আসতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছে। পুজো আসবে, পুজো চলে যাবে,ওদের আশায় অপেক্ষা করে করে আশাটা ও ততদিনে মরে যাবে!

তিতলি

- সুকন্যা সাহা

একমনে জলরঙে তুলি ডুবিয়ে সাদা কাগজের ওপর আঁচড় কাটছিল তিতাস। বাইরের কেউ দেখলে ওটাকে আঁকিবুকি ছাড়া কিচ্ছু বলবে না ; কিন্তু তিতাসের মনে হয় খাতার ওপর যেন জলরঙের প্রজাপতি পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে ...কি যে ভালোবাসে মেয়েটা প্রজাপতি !ডানায় নানা রঙের ছিটে, এক রঙের ওপর অন্য রঙের বুটি... প্রজাপতির নানা রং আর বাহারে মুগ্ধ হয়ে থাকে মেয়েটা সারাক্ষন ...স্কুল পালিয়ে প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়ায় সারাটা দুপুর ... পা টিপে টিপে কাছে যায় ...কিন্তু কি আশ্চর্য্য কিভাবে যে বুঝতে পারে ওরা ! কাছে গেলেই ডানা মেলে উড়ে পালায় ... তিতাসের বাবা মালী ... শহরে কয়েকটা বাড়ীর বাগানে কাজ করে বুধন ... যেদিন যেদিন বাবা শহরে যায় তিতাসেরও যাওয়া চাই ... আসলে ফুলের বাগানে যে হরেক রঙের আর হরেক কিসিমের প্রজাপতি আসে ! প্রজাপতিদের সঙ্গে কথা বলে তিতাস ...

অ্যাই তিতলি তোরা কি আমায় দেখলে ভয় পাস ?

না আ আ... মোটেও না ...

তবে উড়ে পালাস যে বড় ?

আরে আমরা যে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াই ! একটা ফুল শেষ হলে আরেকটা ফুল !

জানিস তো একদিন তোদের সব কটাকে ধরব ... খপ খপ করে ...

আর এই বোতলে ঢোকাবো...
ইসস ... বয়েই গেছে আমাদের তোর বোতলে ঢুকতে ...
তবে রে ! বলেই এক ছুট লাগায় প্রজাপতিটাকে ধরতে আর ধপাস করে পড়ে শান বাঁধানো বাগানের রাস্তায়...
ব্যস আর কি ! পায়ের হাড় ভেঙে দু টুকরো... প্লাস্টার করে একদম বিছানায় ...
এখন বিছানায় বসে রং বেরঙের প্রজাপতি আঁকে সে ... ধুসস সত্যিকারের প্রজাপতির থেকে হাজার গুনে ভালো ...
ধরতে গেলে তো আর পালিয়ে যায় না ... কেমন খাতা জুড়ে উড়ে বেড়ায় ... যখন ইচ্ছে গায়ে হাত বোলায় সে ...

পুজোর দিনগুলো

- অতনু দাশ গুপ্ত

যতদূর মনে পড়ে মা-কে ছাড়া পুজো গত তিন বছর বাদে এর আগে ২০১২ সালে কাটিয়েছিলাম। এর আগে ২০০৪ সালে মায়ের কাছে চলে এসেছিলাম ঢাকার কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে। ওইবারের মত স্মৃতিকাতরতা কখনো কাজ করেনি।

সরকারী কোয়ার্টারের ডরমিটরি থেকে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে দূরের রাইখালী বাজার ত্রিপুরাসুন্দরী কালীবাড়ির মন্দির। ওখানেই পুজো হতো, এখনও হয়। ওপার থেকে মন্ত্রের শব্দ ভেসে আসতো, দিনের বেলা শব্দ শোনা গেলেও রাতের বেলা আশেপাশের নিস্তব্ধতায় আরও প্রগাঢ় হত। সে বছর কিসের পিছুটান ছিল তা আজও স্পষ্ট নয়। শুধু পুজোর ঢোলের শব্দে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আর তিন দিন বাদে পুজো শেষ হলেই আবার ফিরে যেতে হবে কলেজে মাকে ছেড়ে - মনের কোণে বারবার কড়া নাড়ছিল। প্রকৃতিও আমার সাথে কেঁদে চলেছে। কারণ ওই বছরের মত ঝুম বৃষ্টি আমি আগের বছরগুলোতে দেখিনি। বাইরে অঞ্জলি নিতে যাওয়া ছাড়া আর তেমন কিছু করা গেল না। খ্রিষ্টান মিশনারী হাসপাতালের ভেতরের পাড়ায় পুজো হয় প্রতিবছর। দূরদর্শনের পর্দায় পূজো পরিক্রমা দেখা আর রাতে ইটিভি বাংলার পর্দায় পুজো লাইভ দেখলাম।

ওই বছরের দশমীর মত দশমী আর কখনো কাটাইনি। নবমীর রাত হয়ে গেছে আর আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েই চলেছে। দূরের মাইকের শব্দ ভেসে আসছে আর মনের কোণে বিষাদের ছায়ারা ভিড় করছে। ভাবছি, কাল থেকে আর কোন মাইক বাজবে না! বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবো ভাবছিলাম! মা কয়েকবার এসে ডেকে গেলেন কিন্তু আমার ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই বললেই চলে! শেষমেশ মা এসে বললেন ঘুম পেয়েছে। ফিরে গিয়ে বালিশে মাথা রাখলেও ঘুম আসছিল না একদম। বারান্দা থেকে চলে এলেও দূরের মাইকের আবছা শব্দ তখনও ভেসে আসছে। নবমী নিশিকে কোনভাবেই বিদায় জানাতে মন চাইছে না!

বিষন্নতা

- সৌম্য ঘোষ

তার চোখের পাতায় যখন
রাত্রি দেখলাম,
সেই চোখে ছিল না কোন গাছ,
কিংবা মনে করো-
ছিল না কোন তারা!

অবিরত হাওয়ার মতো
প্রদক্ষিণ করে দেখি-
বিষন্ন গোধূলিতে
একটা ভাঙাচোরা বাঁশি।।

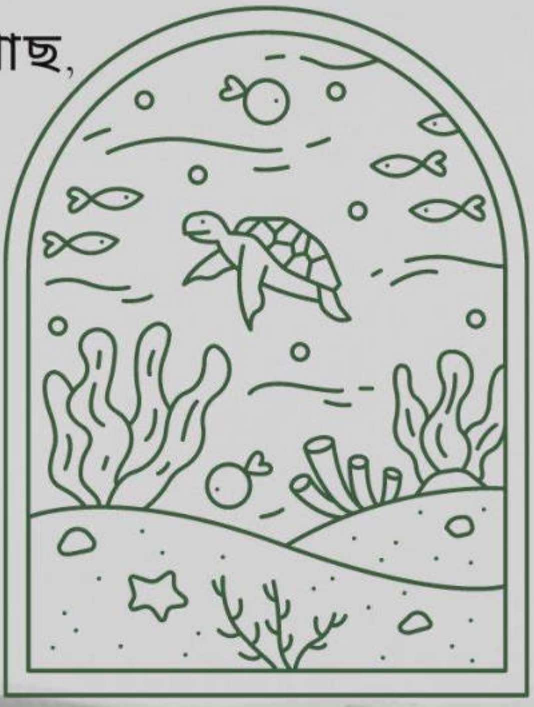

দ্বিতীয় ছায়া

- সৌম্য ঘোষ

উঠোনে শতরঞ্জ খেলে সময়,
গাছের একটা ডাল অহোরাত্র
শব্দ ছিন্ন করে রাতকে।
প্রান্তর জুড়ে ধুলো আর
পোড়া স্বপ্নেরা;

একটা ছায়া অনুলিপি রচনা করে
যা উচ্চারণ করে দ্বিতীয় ছায়া।।

রোগ সারে খেলায়

- বরুণ চন্দ্র পাল

ভোঁ ভোঁ কানামাছি
নিতুই খেলা।
খুঁজতে গিয়ে ফাঁকফোকর
কেটে যাচ্ছে বেলা।
বেশ দিব্যি আধুনিক
যান্ত্রিকে ঝোঁক।
শূন্য হচ্ছে শিশুবেলা
জাগছে কান্নাশোক।
না পুড়লে কাঁচা হাঁড়ি
ধরে না জল।
জীবন মানে শক্তপোক্ত
আয়ুর সম্বল।
চাই সাহায্য সত্যিই
না অবহেলা।
থাকতে নিরোগ নেই প্রয়োজন
ওষুধ মেলা।
শোনো সবে শোনো এখুনি
খুলে রেখে কান।
হাতধরে নিজ সন্তানে মাঠে
করাও যোগদান।

গ্রামীণ চলচ্ছবি

- বরুণ চন্দ্র পাল

মঞ্জুরি মন মগ্ন স্বপন
বৃন্তশাখে দুলছে।
শিশির স্পর্শ গ্রাম্য কন্যে
আচঁলে পুষ্প ভরছে।

নেমে পুষ্করিণী হংসদ্বয়
ডুবছে খুব।
হারিয়ে পথ ছাগশিশু
তুলেছে সরব।

হাটুরিয়া হাটে যায় সাইকেলে
ঘন্টি বাজাচ্ছে জোরে।
জাগেনি এখনো শৈশব সাঙ্গাত
ঘুমিয়ে গেছে ভোরে।

মাড়ুলি দেয় বউ ঘোমটায়
সারা ঘরময়।
পরিধান বাসি রেখেছে খুলে
শাশুড়িকেই ভয়।

দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে গোয়ালিনী
নিশ্চুপ যদ্দুর।
খুব শাসায় রাগী গোয়ালা
না ধেয়ে আসে বাছুর।

দিদা

- দিশানী বোস

দিদা, ও দিদা............
শুনতে পাচ্ছো আমায়?
দেখতে পাচ্ছো আমায়?
কেন আমাকে একা করে চলে গেলে?
তোমার মনে পড়ে সেই সময়ের কথা-
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম?
আমাকে কোল থেকে নামাতে না তুমি,
আমাকে বুকে করে আগলে রাখতে সবসময়,
আমার কান্না শুনলে তুমি খুব কষ্ট পেতে তাই না?
তাহলে আজ আমাকে রেখে কোথায় চলে গেলে?
এসো না আর একবার আমার কাছে,
আমি যে আবার তোমার
কোলে মাথা রেখে শুতে চাই,
তোমাকে ছাড়া যে আমরা অসম্পূর্ণ;
কোথায় গেলে তুমি ?
আজ তোমাকে ছাড়া ওই বাড়িটা খুব ফাঁকা;
জানো, সবাই বলে তুমি নাকি আর নেই;
কিন্তু আমি জানি তুমি
আমার সাথে সবসময় থাকো।

পুজো

- দিশানী বোস

আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ,
চারিদিকে কাশ ফুলের মেলা,
ভোরবেলা রেডিও তে মহালয়া,
দোকানে দোকানে প্রচুর ভিড়,
বাতাসে আগমনীর সুরের মধ্য দিয়ে
মা দুর্গা এলেন বাপের বাড়ি।
মা এর আগমনে চারিদিক হয়ে উঠলো প্রাণবন্ত,
মন্ডপে মন্ডপে প্রতিমার সুমিষ্ট গন্ধ;
ঢাকে পড়ল কাঠি,
মা এর পায়ে পড়ল অঞ্জলি,
আলোকসজ্জা তে সেজে উঠল শহর,
রাস্তায় বেড়ে চলেছে মানুষের ভিড়,
কিন্তু শীঘ্রই চলে এল সেই দশমীর দিন।
সবার চোখে নেমে এল বন্যা,
প্রকৃতি যেন মিশে গেল অন্ধকারের সাথে,
মা দুর্গা গেলেন ফিরে
সবাই রইলো আসছে বছর-
মায়ের আগমনের আশায়।

ভালোবাসা এত কি কঠিন

- শম্পা সাহা

যদি একজন প্রেমিক পেতাম জিজ্ঞাসা করতাম ভালোবাসো তো?
যদি একজন বন্ধু পেতাম জিজ্ঞাসা করতাম ভালোবাসিস?
যদি কোনো সঙ্গী পেতাম জিজ্ঞাসা করতাম
সঙ্গে যাবে তো রাস্তার শেষ পর্যন্ত
থাকবে তো ধরে হাত শক্ত করে?
কেন কে জানে? ভালোবাসা পাওয়া এতো কঠিন কেন?
এত সরল শব্দের এত জটিল ব্যাখ্যা কেন?
চারিপাশে এত প্রেম প্রেমের ভিড়ে ভালোবাসারা আজ নিরুদ্দেশ
কত মানুষই তো আসে
সেই মানুষটা আসে নাতো কই
যে সারাজীবন পাশে থাকবো কথা না দিয়েও থেকে যাবে ছায়ার মতন
শরীরের পাশে নয় মনের পাশে
পাশাপাশি দুটো মন হোক না নদীর দুই পাড় তবু
পাশাপাশি সমান্তরাল আজীবন

দেয় না কথা কেউ
দিলেও যে রাখে আরো কম
মন ভাঙ্গে আঘাতের শেষে
সবাই কি উঠে দাঁড়াতে পারে ফের বার
কারো কারো মনের কপালে তাই শুধুই অন্ধকার!

ব্যস এইটুকুই

- শম্পা সাহা

যদি চাইতে সব ছেড়ে এক ছুটে দৌড়োতাম তোমার ঠিকানায়
যদি চাইতে এক ডুবে পৌঁছে যেতাম তোমার গভীরে
যদি বলতে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতাম তোমার দু গাল
একবার মুখ ফুটে বললেই
বাগানের সব গোলাপ কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হয়েও
উজাড় করে দিতাম তোমার খোঁপায়
জুঁইগন্ধী তোমার উপস্থিতি তোমায় পুজো করতে বলে
কামিনীর মত সফেদ স্নিগ্ধতা আমায় বুঝিয়ে দেয়
নারী কি অপরূপ মোহময় জ্যোৎস্না
যাতে ভিজতে ভিজতে অনুভূতি আপাদমস্তক অবগাহনের
ছাতিমের মত তোমার শরীরের খাঁজে ভাঁজে মসৃণ উপত্যকায়
যত রহস্য তাতে হার মানে আমাজনের গভীর গহীনতা
মারিয়ানা খাত ও নেহাৎই ছোট বিল তোমার মনের গভীরতার কাছে
তুমি আমার সেই রহস্য ঘন বর্ষাবন
যাতে বারবার হারাতে চাই নিজেকে
হারিয়ে নিঃশেষ করে নিজেকে ভেঙে চুরে
শুধু তোমার উপস্থিতি সারা গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকবো
এক বয়োবৃদ্ধ বটবৃক্ষের মত
যার ঝুরি নেমে প্রবেশ করবে তোমার সবুজ মাটির গভীরতম গভীরে
ব্যস এইটুকুই আর কিচ্ছু চাই না আমার।

ভালো পাত্র

- আবীর মহাপাত্র

আঁধারে শুভ বুদ্ধির আলোই পৌঁছাক বা মেয়ের বাবারা শুধু চাকুরে জামাই চাই, এই স্থির সিদ্ধান্তে অটুটই থাকুক, মিনতি শেষ পর্যন্ত বিনা পণে ছেলের বিয়েতে রাজি হল। গোবিন্দ এবার অনেকদিন পর জয়ের বিয়ের উপাড় পেয়েছিল। আগের বার গুলোর মত আর কেউই মন মত চাইল না, এমনকি গোবিন্দ মিনতির আদরের বুলুরও হবু বৌদি পছন্দ হল। বুলুর জন্যেও কিছুদিন আগেই প্রথম উপাড় এসেছিল। ছেলের ইলেকট্রিক্যালের চালু দোকান। গোবিন্দ বলেছিল, এ বছরই কলেজে ভর্তি হয়েছে, দেখি আর একটু, ভালো পাত্র পাই যদি।

বৌমা রিনা সংসারের কাজ প্রায় সবই জানে। গোবিন্দ জয় দুজনে মিলে মুদি দোকান চালায়। গোবিন্দর স্বর্গত বাবাকেও এই দোকানে বসতে দেখেছি। বিরাটডি গ্রামের বড়, শহরের ছোট। ওদের দোকানে বিক্রি বাটা ভালো।

বুলুর জন্য পেশায় শিক্ষক জামাই খুঁজছিল গোবিন্দ। ছবি দেখে সবাই আগ্রহ দেখায়, পরে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন শুনেই অনেকে ছবি ফেরৎ দিয়ে দেয়। এই প্রথম দেখতে আসছে একজন। পাত্র বড় স্কুলের শিক্ষক। বুলুর চেয়ে বছর পনেরো বয়সে বড়, এটাই যা একটু শুনতে খারাপ। ওরা অবশ্য বলেছে পণ তারা নেবে না, একটু দেখতে হবে যেন মান থাকে।

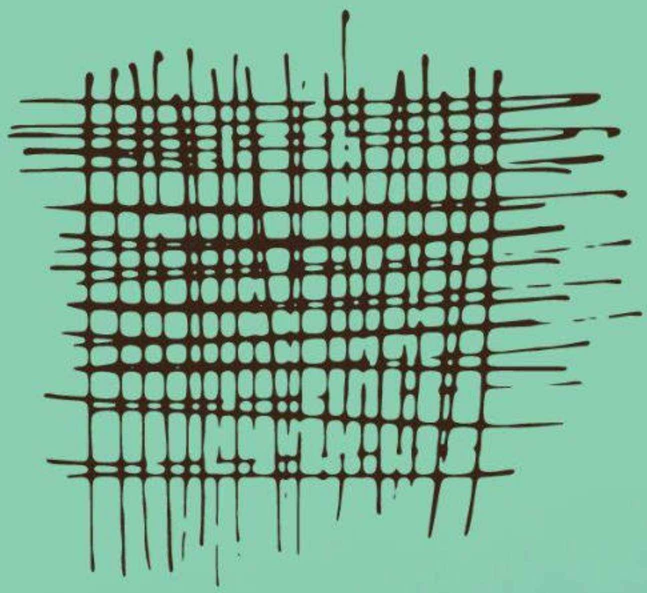

একবার রিনা শুধু বলল, পাত্র আমাদের বুলুর চেয়ে অনেক বড়। আর এই মান রাখার ব্যাপারটা আবার বেশি জটিল, বোঝাই মুস্কিল ঠিকঠাক হল কিনা! মিনতি বলল, দেখ বৌমা, তোমার বাবা তোমার জন্য কিছু জমান নি বলে ভেবো না, আমরাও বুলুর জন্যে কিছু রাখিনি। ও নিয়ে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

ছলছল চোখে রিনা ওদের শোবার ঘরে বিছানায় গিয়ে বসল। রিনার মনে পড়ে গেল, সে তার বাবাকে বলেছিল, বাবা তুমি আমাদের জন্য বরাবর পোশাক এক সাইজ বড় কিনতে, যাতে বছর দুই সেগুলো পরতে পারি। এখন কিন্তু বড় হয়েছি, আর যেমন লম্বা হব না, লেখাপড়াতেও বাড়ব না। টেনেটুনে বিএ পাশই তোমার জামাই খুঁজো কিন্তু।

আনন্দের দিনকাল

- মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ

আনন্দ শীলের বাড়ি আনন্দপুর। মানুষকে আনন্দে রাখাই তার কাজ। নিজের ঘরে নিরানন্দের বাড়াবাড়ি। আর এই নিরানন্দের কারণে রোগ তার পিছু ধাওয়া করে সবসময়ই। তবুও আনন্দ নিজেকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করে।

নিঝুম গাঁয়ের রিজু বৈষ্ণবীর করতালের টুংটাং শব্দের সাথে কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করে সে। কিন্তু সেলুনে তো কাস্টমার নেই। ড্রয়ার খালি। গ্রামের মানুষ শহরে আসে কম। তার ওপর লকডাউনের ওঠানামা।

বৈষ্ণবী তাকে গান শোনায়। চারপাশটা ক্ষণিকের জন্য জেগে ওঠে। কিন্তু গান শেষ। শ্রোতারা চলে যাচ্ছে।

আনন্দ আশ্বাস দেয়--- চিন্তা করবা না। আমি তোমারে পোষায়া দিমু।

ক্যামনে দিবা। তোমারই তো শূন্য থালা।

শুন্য না গো। শূন্য না। আমার ঘরে চার চারটা মাইয়া।তিনডারে বিদায় করছি। একটা বাকি। জামাইরা যখন নিমন্ত্রণে বাড়ি আসে তখন আমার ঘর আনন্দ উপচাইয়া পড়ে।খালি খরচাপাতি বাইড়া যায় এই আরকি ---।

বৈষ্ণবী ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বলে ---
ম্যালা দিন পরে তুমি আমারে হাসাইলা। এইটুকুতেই আমার চলবো। বাকি পথটা হাঁটতে পারব।যাইগো যাই। পয়সা আরেকদিন নিমু নে।
আড়ষ্ট শরীরে বৈষ্ণবী উঠতে গেলে আনন্দ তাকে বসিয়ে দিয়ে বলে -- চুপ কইরা বসো।পয়সা নাই। তাই বলে নাস্তা খাওয়াইতে পারব না?
আনন্দ গোবরার স্টল থেকে দুটো নিমকি আর এক কাপ দুধচা এনে দিয়েছে।
এসময়েই ঘরে ঢোকে ব্যাঙ্কার অনিন্দ্য ।হাতে পুজোর বাজার। চুল কাটবে। শেভ করবে ।
দেয়ালের দিকে টাঙানো গণেশের দিকে তাকিয়ে ক্ষুরটা কপালে ছোঁয়ালো।
কাজশেষে অনিন্দ্য বললো --- পুজো নিয়ে ঝামেলার মধ্যে আছি। তোর টাকাটা কয়েকটা দিন পরে দিতে হবে।
অনিন্দ্য বেরিয়ে যাবার পর আনন্দ অট্টহাসি দিয়ে বৈষ্ণবীকে বললো--- কী বুঝলা পিসি? আরেকটা গান ধরো।

বলিনি কাউকে

- বন্যা ব্যানার্জী

তুমি এলে।বলিনি কাউকে।
বন্ধ দরজা ঠেলে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে।
আমার বন্ধ কপালে তোমার ছোঁয়া।
আমি হাঁটছিলাম,অসুস্থতার পাহাড় ডিঙিয়ে
অভিমানের আড়াল সরিয়ে।
অনন্ত বিষাদ মাখা ঠোঁটে কনে দেখা আলো।
বনজ হয়ে উঠলো সমস্ত মাইটোকন্ড্রিয়া।....বলিনি কাউকে।
তোমার গন্ধে ঘুম ভেঙে গেছে কখন।
আর কেউ নয়,শুধু আমি জানি। তুমি এলে। উঁহু বলিনি কাউকে।

সূচিপত্র

- বন্যা ব্যানার্জী

কবিতাটি পড়ে নিও। সূচিপত্র পুজোবার্ষিকীর তিনশো বাষট্টি নম্বর পেজ। অনেকের ভীড়ে আধখানা। ঠিক যেমন ভীড় বাসে কোনরকমে সিট মিলে যাওয়া। ছাপোষা কিছু শব্দ,লাল টিপ দুধে আলতা শাড়ি আর বোধনের উৎসব।

তবু এ লেখা শুধু তোমার জন্য।

তোকে কোথায় রাখি বলতো

- প্রসাদ সিং

আমার এক হাত কাঁপলে
অপর হাতও কাঁপতে শুরু করে
কবিতা লিখতে গিয়ে
ভুল হয় বানান

তোর জন্য
আমার বুক স্পন্দিত হলে
তোর বুক
আমার জন্যও কি স্পন্দিত হয়

এই ভুলে ভরা পৃথিবী তে
পৃথিবীর এই অনিশ্চয়তায়
তোকে কোথায়
রাখি বলতো

কতোটা ভাঙবো বলতো

- প্রসাদ সিং

আর কতোটা ভাঙবো বলতো
বহু পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে
আজ সুউচ্চ মালভূমি
বহু নদী পাড় ভাঙতে ভাঙতে
আজ গিলে খাচ্ছে সভ্যতা

আর কতোটা ভাঙবো বলতো
পাহাড়ের ওপর থেকেও
তোর ঘর দেখা যায় না
নদী পথে তোর ঘর যাবো ভেবে দেখি
শুকিয়ে গেছে জল

লন্ডনে এক বিদেশি

- সুজিত বসু

রাজার নকল জরি মুক্তোমণি ঝুটো তাই এখন সাগরে
এ সব সমস্ত কিছু ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হয়, এখন বিশাল
সাগরে জাহাজটুকু দাঁড়িয়েছে ম্লানমুখে ফোকসটোন বন্দরে.
কোথায় প্যারিস আর কোথায় রোমের জ্যোতি, সুজিত হে শাল
মহীরূহ হয়ে খুব জ্যোৎস্নাময় জ্যোৎস্নাময় কুয়াশাচাদরে
জড়াও নিজের দেহ, সমস্ত কুয়াশামোড়া যেমন লন্ডন
তান্ত্রিক ভৈরবী বেশে লুকোয় দানবী মুখ, বিগবেন ঘন্টায়
অন্তিম প্রলয় সুর নিনাদে গম্ভীর ঘন, তুমিও যেমন
সক্রোধে ছড়াও মুখে রক্তিম কালিমা ছবি, ঘড়ির কাঁটায়
তেমনই কাঁটার ছাপ, পিকাডিলি চত্বরের নগ্ন নারীদেহে
কিছুটা বিশ্বাস আর কিছুটা মোহিনীমায়া ব্যাকুল সন্দেহে
কপালে ভ্রূকুটি আঁকে, তুমি খুব দূর থেকে তান্ত্রিক নিয়মে
সন্তর্পণে গুণে নাও তোমার সীমিত মুদ্রা, তার পরিশ্রমে
কপালে কয়েকটি ঝরে বাদামি মুক্তোর বিন্দু, কুহকী শহরে
কি রকম শীত শীত, জুলাইতে এরকম আশ্চর্য গরমে
লুকোবে প্রবাসী তুমি কোথায় একান্ত মুখ
দূর প্রাচীনতা দিয়ে মায়াবিনী রোমে!

মধ্যরাতে ভয়
- সুজিত বসু

মধ্যরাতে জেগে উঠি, জেগে উঠি ভয়ে
শরীরে ভয়ের কণা, বিন্দু বিন্দু ঘাম
মধ্যরাতে জেগে উঠি বড়ো অসময়ে
আমাকে জড়ায় শুধু লোভ মোহ কাম
আয়নায় লোমশ জন্তু মেলে ধরে থাবা
আয়নায় এ কার মুখ, এ তো নই আমি
আর্তনাদে জাগে বউ, দৌড়ে আসে মেয়ে
বউ বলে 'এ কি করছো, কেন এ পাগলামি!'
মেয়ে বলে 'কেন করছো, কেন বলো বাবা?'
'বাবাকে চিনিস না তুই, কুঁড়ে অলপ্পেয়ে !'
কি যে হলো এ জীবনে, শুধু বাড়ি গাড়ি!
কোথায় অমলকান্তি, কোথায় রোদ্দুর !
আমি এক অপদার্থ, একান্ত আনাড়ি
কোথায় স্বপ্নের রাজকন্যা থাকে, বাড়ি কত দূর!
কিছুই হইনি জেনে নিজের উপর হলো ঘৃণা
না, কোনো স্বাপ্নের মধ্যে এখন যাচ্ছি না।

সময়ের ধারাপাতে

- প্রবীর রঞ্জন মণ্ডল

বিবর্ণ হলেই পাতা শুধু নয়
পাতার মতোই কতকিছু ঝরে যায়।
জলতরঙ্গের টোপ টোপ ফোটা
নবীন বোঁটায় জাগে প্রাণের স্পন্দন
কত অনুসঙ্গ জেগে ওঠে মাথার ভিতর।
আজকে যারা আধা জীবনের গল্পে জেগে আছি
দুর্ভিক্ষের খিদে লাগা ভয়ার্ত বিড়ালের মতো
তাদেরও নবীন বোঁটায় থাকা পাতা হয়ে
থাকতে ইচ্ছা জাগে এই ইহলৌকিক জগতে।
কেননা আমাদের জীবনের সুখ দুঃখ
হাসি কান্নারা এই আধা সময়ে এসে
ছুঁয়ে দিয়েছে জীবনের পরশপাথর।
বিবর্ণ পাতারা জাগতিক অভ্যাসে ঝরে যায় ;
ঝরে যাক ক্ষতি নেই।
একদিন ঠিক ঠিক সময় আসলে
আমরাও না হয় অনুসারিত হবো
সময়ের ধারাপাতে।
এখনতো আমাদের সময় নয়।

সময়ের দেওয়াল ঘড়ি

- প্রবীর রঞ্জন মণ্ডল

সময় মাপতে চাইছে লোকটি

অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছে পথ
মসৃণ,বন্ধুর,উত্তাল, এবড়ো খেবড়ো
যা ছিল আগে।

সূর্যের শেষ হাসিতে অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে
এক পা,দু'পা করতে করতে
শেষ সিঁড়ির ধাপ;
নিশ্চিত ধাপ কাটলেই পরপার।

এখন পকেটে হাত দিয়ে
খুচরো পয়সার হিসাব গুনতে চাইছে সে!

সময়ের দেওয়াল ঘড়িটা থমকে দিতে চাইল
লোকটি;
মানুষের দিকে হাত বাড়ালো
প্রসারিত করে অবারিত দুটি হাত।

মানুষই তাকে পৌঁছে দিল
চিরায়ত এক আলোর ভুবনে।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি

- নিত্য রঞ্জন মণ্ডল

ঝড়ের মত জীবনটা আকাশের কাছে বিক্রি করেছি
যত শান্তি গোধূলি আলোতে ভেসে ভেসে যায়
ঝড়ের মত কান্না ব্যাতিক্রম মন বেঁচে থাকার স্বপ্ন
ওগো বন্ধু, কেমন করে বেঁচে আছি দেখে যা
মাটির ঘরে পচা দেহ,খিদের দুনিয়া কেউ বোঝে না
অভাব আমারে বড় ভালবেসে ফেলেছে
রাত দুপুরে মায়ের কোলে শিশু খিদের জ্বালায়
কেঁদে কেঁদে অন্ধকারে ডুবে মরে;
ওগো বন্ধু, দেখে যা একবার আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি।

ভাঙাগড়া

- সুব্রত নন্দী

আসছে সম্মুখে ভাঙা গড়ার হিসেব,
লালনের সংসারে দ্রোহের অনল!
বিশ্বাসী মন উবে গেছে অবেলায়,
বিরহের কবিতা নষ্টনীড়ে সচল।

অকালেই ঝরে পড়ে ঠোঁটের উষ্ণতা!
আঁধারময় শূন্যতা প্রেমের দুয়ারে,
বালিশ ভেজা রাত দহনের ছোঁয়ায়!
মনের মানুষ বন্ধনহীন আঁধারে।

স্রোতের উজানে সামাজিক নিরাপত্তা,
সিঁথির সীমানা কম্পিত অমানিশায়,
নারী শুধু মেলায় অঙ্কের বেহিসাব!
ভগ্ন রেশ পড়ে থাকে ভোরের বেলায়।

আলোর সন্ধানে

- সুব্রত নন্দী

এই চন্দ্রমার পরজীবী আলো আজ দ্বিধান্বিত,
এই সূর্যের আলোয় ভাগাভাগির খেলাঘর!
আলোর দীর্ঘশ্বাস প্রসারিত এই ভুবনডাঙায় -
এখন কাগজের নৌকায় ভেসে বেড়ায় বেদুইন মন,
কম্পাসের দিক নির্দেশনা মুষ্টিমেয় মানুষের পকেটবন্দী;
আলোছায়ার খেলায় বিবর্ণ ক্যানভাস চতুর্দিকে,
ধূসর বিকেলে অস্তমিত প্রস্ফুটিত হতাশার ছায়াছবি,
আলোর রোশনাই ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে,
আকাশের দিকে স্বীকারোক্তির সন্ধানী চোখে তাকিয়ে জনগণ,
আলো আঁধারিতে কম্পিত মন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বারংবার।

থাপ্পর

- শংকর ব্রহ্ম

আর বেশী দিন বাকি নেই পূজার।
হরনাথ বাবু পূজার বাজার সেরে বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে তার মেয়ে অনামিকা ছিল। উবের-ট্যাক্সী গাড়ি থেকে জামা কাপড়ের প্যাকেট,জুতোর বাক্স ঠিক মতোন নামল কিনা তার তদারকিতে ছিল অনামিকা। কেনা কাটার সমস্ত জিনিস নামিয়ে এনে খাটের উপর রাখা হলো।

সব প্যাকেট খুলে ফর্দ ধরে জিনিস মিলিয়ে নিতে লাগল অনামিকা।সে একটা প্যাকেট খুলে বলল,বাবা তুমি ক'টা গেঞ্জী কিনেছো?

- কেন, দু'টো।দু'টোরই তো দাম নিলো
কেন কম দিয়েছে নাকি, শালারা যা চোর।
- কম দেয়নি বাবা, বেশী দিয়েছে একটা।
- মানে?
- তিনটে দিয়েছে, ভুল করে।
- বেশ ঠিক আছে রেখে দে। হরনাথ বাবু পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন।বললেন, নে নে সব মিলিয়ে নে ভাল করে।

লিসূট ধরে মেলাতে মেলাতে, একটু পরে অনামিকা বলল, বাবা মায়ের শাড়িটা তো পাচ্ছি না।

- সে কি রে? কোথায় ফেললাম আবার?
সব নিয়ে তো ওই গেঞ্জীর দোকানটাই ঢুকে ছিলাম, শেষটায়। বোধহয় ওখানেই ফেলে রেখে এসেছি। সেখানে পড়ে থাকলে কি আর ফেরৎ দেবে? যা চোর ব্যাটারা সব।

রাতে ভাল ঘুম হলো না হরনাথ বাবুর। পরের দিন সকালেই হরনাথ বাবু ছুটলেন গেঞ্জীর দোকানে। দোকান খোলা দেখে মনে মনে খুশি হলেন। দোকানে ঢুকে দোকানদারকে বললেন, দাদা কাল কি এখানে একটা শাড়ির প্যাকেট ফেলে রেখে গেছি?

- হ্যাঁ দু'টো প্যাকেট পড়ে আছে, দেখুন কোনটা আপনার?
- এই তো এই'টা। বাঁচালেন মশাই, বারোশো টাকা দামের শাড়িটা।
- দেখুন না, কাল তাড়াতাড়িতে আমাদেরও দু'একটা জিনিস চলে গেছে, সামান্য গেঞ্জী রুমালের ব্যবসা আমাদের, দু'একটা গেলেই খুব ক্ষতি হয়ে যায়।

অপরাধী সাব্যস্ত করে যেন কেউ হরনাথ বাবুর গালে আচমকাই সজোরে এক থাপ্পড় কষালেন।

পরিক্রমা

- সোমনাথ সরকার (উদয়)

পূর্ণিমা রাতে ভরা জ্যোৎস্নায় নিঝুম অরণ্যের বুকে
সিঁথির মত জেগে থাকে একফালি নির্জন পথ

সেই পথ ধরে হেঁটে যেতে যেতে
আমি ছুঁয়ে ফেলি চাঁদের চিবুক

রাতের অরণ্যে এক অশরীরী শীতল হাওয়া
বাঁশীর ভেতরে ভরে দেয় এক মায়াবী সুর

হাজার জোনাকির আলোয় উন্মুক্ত হয়
নক্ষত্রমন্ডলীর অপার রহস্য মনের ভেতর

আর দুঃখ সুখের গন্ডি ছাড়িয়ে দেহহীন আমি
পরিক্রমায় থাকি নিরাসক্ত মহাকাশের আঙিনায়

ভাবনার খেলা

- সোমনাথ সরকার (উদয়)

মনের দিগন্ত জুড়ে ভেবে যাই, শুধু
বিষয়কে নিজের মত পাল্টে পাল্টে নিয়েছি

নিজেকে একটা গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখলে
এভাবে ডানা মেলে দেওয়া যেত না কিছুতেই

কোনও ভাবনা ক্রমে ক্রমে ফিরে আসা মানেই
মনে উদ্বেগের দখলদারি, আর
খোলা হাওয়ায় উদ্বাহু হওয়ার অনতিক্রম্য বাধা

যা কিছুই ভাবি
সবই যে সত্যের পথ ধরে মিলে যাবে ঠিক
তেমনটা ভাবিনি কখনও
তবু মন-মাঠে খেলে যাই ভাবনার খেলা
নিজস্ব ঢঙে, ভালোবাসি বলে

বাস্তবের বৃত্তে যদি লীন হয় কোনও ভাবনার প্রকাশ
তৃপ্তির স্রোতধারা মগজ থেকে নেমে আসে
হৃদয়ের আশ্রয়ে

আলোয় ফেরা

- বিপ্লব সরকার

মশিউলি বনে উঁকি মারে, প্রেমিক মেঘের দল,
কাশের বনে হাওয়ায় ছোটে, নদীর কলকল;
তোমায় নিয়ে অনেক দুরে, পাহাড় সারি সারি;
চালের ফাঁকে চাঁদের উঁকি, ঐ আমাদের বাড়ি।
ওই আকাশে মেঘের ফাঁকে, মা দুর্গা হাসে;
নাম না জানা বনফুলে, পুজোর গন্ধ ভাসে।
শ্বাপদ হাঁটা শুড়িপথে, হাওয়ার কানাকানি;
জনহীন এই মন অরণ্যে, ঢাক শঙ্খ ধ্বনি।
আরণ্যকের গভীর বনে ভানুমতিদের ডেরা,
দোবরুপান্নার দূর পাহাড়, সে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা।
ঐ দেখা যায় চাঁদের পাহাড়, ঘন সবুজ বন;
বসনহীন সব বনপরীদের ,দেহাতি আমন্ত্রন।
নিঃসীম রাত,সময় স্থির, ফিসফিস করে কারা;
ডাকে ছায়াপথ নীল আকাশে, সঙ্গী ধ্রুবতারা।
তোমায় নিয়ে আকাশ নীলে ভাসার সময় হলো;
কালোয় ভরা জীবন ছেড়ে, আলোয় ফিরি চলো।

https://www.shabdodweep.co.in

তোমার জন্য কবিতা

- বিপ্লব সরকার

একফালি চাঁদ আমায় আগলে রাখে,
রাত্রির খেয়া এগিয়ে যাক না যত-
হারিয়ে যাকনা সময় অসীম বাঁকে;
ফিরবে আবার খানিক তোমার মত।
আলোর তোরণে ঘোরার সময় শেষে,
ক্লান্ত বিকেলে শাপলা শালুক ফুল-
একটু দাঁড়িয়ে গোধূলি আলোর রেশে;
আপন খেয়ালে হয়ে আছে মশগুল।
দাঁড়াও যদি শেষ বিকেলের আলোয়,
অনন্ত রাত জাগতে পারি তবে-
উল্কাচেরা জোনাকি রাতের কালোয়;
চিরন্তন এক কাব্য লেখা হবে।
জোনাকি জানে জ্যোৎস্না রাতের মানে,
আদিম রাতে আগুন হয়ে জ্বলে-
পায়ের ফাঁকে পুরুষ পেশীর টানে;
হারিয়ে সময় আলেয়ার পথে চলে।
আলোর মেলা রোদেল মেঘের পালে,
হাওয়ার টানে উড়তে চা'ক না যত-
ফিরবে আবার দিন ফুরানোর কালে;
ফিরবে আবার খানিক তোমার মত।

ফেসবুক ও একটা মেয়ের কথা

- অমল ভৌমিক

ফেসবুকে আলাপ-- আলাপ থেকে প্রেম,
প্রেমটা ভাদরের মেঘ হয়ে ভাসতে ভাসতে
ছুঁতে চেয়েছিল অদেখা নীল আকাশটাকে।

তারপর ডেটিং- প্রথম দেখা ,
কাশফুলের মতো শুভ্র হাসির মায়াজালে নিজেকে হারিয়েছিলিস,
ভালোবাসার মোহে নিজেকে সঁপেছিলিস
রেস্টুরেন্টের মৃদু আলোয়।

পরের ঘটনা-- মিসিং ডাইরি,
তোর নিরুদ্দেশের খবরটা ভেসে উঠেছিল টিভির পর্দায়--
ব্রেকিং নিউজে।
কিছুদিন পর, ক্যানেলের জলে ভেসে উঠেছিল
অর্ধনগ্ন একটা তরুনীর লাশ,
তখন তুই একটা আননোন বডি,
সনাক্তকরনের পর পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট বলল গ্যাংরেপ।
তোর বাড়িতে শাসক-বিরোধী,
সমাজসেবী আর সাংবাদিকদের ভিড়,
ক্যামেরার ফ্ল্যাস লাইটে তোর ছবিটা ঝলসে যাচ্ছিল,
টিভি চ্যানেলগুলো কয়েকটা সন্ধ্যে তোকে নিয়ে কাটিয়েছিল।

অথচ ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের সবুজ আলোটা বলছে
ওরা জেগে আছে--
ওরা নিরাপদে আছে।

মধ্যবিত্ত

- দোয়েল পাল

আমাদের কেটে যায় দিন মধ্যবিত্তের সুখে
ছাতিমের গন্ধে মিশে যায় মায়ের মুখের রূপকথা,
এক তরকারি ভাতের ফাঁকে তেরোর ঘরের নামতা
বাবার ছেঁড়া বুকপকেটে রাখা মধ্যবিত্তের ব্যথা।

শানঘাটের শৈবালদামে আটক মধ্যবিত্তের জীবন
অসময়ের জ্বরে মায়ের আঁচলে ঘুম খুঁজি,
বাবার আজও ফিরতে দেরি হয় কাজের শেষে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা থাকে মধ্যবিত্তের পুঁজি।

তারাদের সাথে রাত জাগে মধ্যবিত্তের স্বপ্ন
শ্রাবণের ছুটি হয়, আগমনীর সুরে শিউলির আনাগোনা,
একটা ছাপা শাড়ি, দুটো ফ্রকের সাথে দশমীর মিষ্টি
মধ্যবিত্তের আগুনে এবারও বাবার নতুন জামা হয় না।

আনন্দ না কি পরমানন্দ

- শান্তি দাস

লিখছি আজ, যা লেখার কথা নয়;
সকলরই এইসব লিখতে করে একটু ভয়!
আনন্দ... না, এত পরমানন্দ;
পোড়া কিছুর আসছে গন্ধ!
যদিও পরমানন্দে ভরা মন,
তবুও সুখ খুঁজে সারাক্ষণ।
এ-মা এই তো সুখ ,
দুটো রুটি ,আর একটা বিস্কুট।
এতেই হবে, এতেই হবে; বেশি কে চায়?
রাগে দুঃখে উন্নতি দেখে মাথা চড়ে যায়।
একটু নুন নেই যখন পান্তা ভাতে,
তখন তাবোড় লোকেরা বক্তিতায় মাতে!
সাময়িক খোঁজ নেয়,সাময়িক বেগ দেয়;
শুধু নিজের ধান্দায়,যদিও বাজার এখন মন্দায়!
এইতো পরমানন্দ !
যার গন্ধে জনগন আজ অন্ধ।
কেউ করেনা প্রতিউত্তাপ,
নেই কারো কোনো অনুতাপ।
সকলেই সুখ ভোগে ব্যস্ত,
পরমানন্দের সূর্য উদয়ের আগেই অস্ত!

তারা

- ইন্দ্রাণী সমাদ্দার

আজ তিয়া মায়ের সাথে কলকাতায় যাচ্ছে। আগে বছরে অন্তত একবার কলকাতায় যেতো। কী যেন একটা অসুর এসেছে? কী যেন নাম- করোনাসুর। সেই রাক্ষসটার জন্য এতদিন সে কলকাতায় যেতে পারেনি। এবার মায়ের সঙ্গে কুঝিক্ ঝিক্ করে চলেছে কলকাতা কিন্তু মনে যতটা আনন্দ হবার কথা ছিল ততটা হচ্ছে না। কারণও আছে- এখন অনলাইন ক্লাস। স্কুল থেকে ড্রইং, গান থেকে নাচ সবই অনলাইনে। তাই তিয়া দিল্লীতে থাকুক বা কলকাতায় তাতে কি এসে যায়! পড়াশুনো থেকে গান, নাচ, ড্রইং সব কিছুর ক্লাস করতে হবে। মন খারাপের আরেকটা কারণ আছে। এই প্রথমবার তিয়া কলকাতায় গিয়ে তার আদরের দাদাইকে দেখতে পাবে না। দুষ্টু করোনাসুরের জন্য দাদাই আকাশের তারা হয়ে গেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর তিয়ার মা তিয়াকে আপার বার্থ নাকি লোয়ার বার্থে শোবে জানতে চান। তিয়া জানায়, আপার বার্থে শুলে যদি ধুপ করে পড়ে যায়। তখন তিয়ার মা তিয়াকে লোয়ার বার্থে শোবার পরামর্শ দেন। তিয়া বলে –'ওরে বাবা! যদি মা তুমি রাতে উপর থেকে ডিগবাজি খেয়ে আমার উপর পড় তাহলে আমার হাত –পা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমি তখন কিমকিম বা পুইপুই দের সঙ্গে খেলতেই পারব না।' মা বিরক্ত হয়ে গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকেন। তিয়া মোবাইলে গেমস খেলছে। তিয়ার মা শ্রাবণীর মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। করোনা এসে বাচ্চাদের জন্য মোবাইলের ছাড়পত্র মিলেছে। মোবাইলের হাত ধরে বাচ্চারা একা একা চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে শিখেছে। শ্রাবণী তিয়াকে বলেন শোবার জন্য কিন্তু তিয়ার এক কথা এক সঙ্গে শোবে। শ্রাবণী তিয়ার বাবাকে ফোন করে সব জানান। তিয়ার এখন আট বছর বয়স। একসঙ্গে ঠিক করে শোওয়া যায় না। বাবার বকানি খেয়ে তিয়া লোয়ার বার্থে শোয়। ঘুমিয়েও পরে। তিয়া স্বপ্ন দেখে আকাশে এক উজ্জ্বল তারা। সেই তারা তিয়াকে বলে ওঠে –'তুমি অথবা মা কেউ পড়ে যাবে না । নিশ্চিন্তে ঘুমাও' তিয়া পাশ ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

জননী

- ডাঃ অনিরুদ্ধ পাল

সবুজে সবুজে সাজানো তুমি
আমার সোনার বাংলা আমি জানি।
সবুজের ঐ প্রান্তরে উদ্যম রাস্তার
আঁকা ছবি ধরে বাঁধন মায়ার।
আকাশে বাতাসে প্রাণে শুনি
তোমার সুধা নির্ঝর অমোঘ বাণী।
নেহারি তব শোভা বটের মূলে, নদীর কূলে,
নেহারি তব মধুর হাসি সবুজ অরণ্য প্রান্তরে ----
নদীর কলতান, পাখির সুমধুর গান
নীল আকাশের টান -- সবেতেই তুমি মহান।
তোমার মাঝে রয়েছে পাহাড়, রয়েছে সাগর ----
মানব জনমের গমন পথে দেখি তব খেলাঘর।
কাটিল মোর বাল্য, কৈশোর, যৌবন।
কাটিল মোর প্রৌঢ়, বার্ধক্য জীবন।
জানি গো জানি -- এখানে আপন কিছুই নয়,
তবুও তোমার রূপ করে মোরে বিস্ময়।
আমি সোনার বাঙলার গান গাই,
আমি বাংলা ভাষায় গান গাই,
আমার আমিকে চিরদিন তাই
এই বাঙলায় সর্বত্র খুঁজে পাই।
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মেখে ধন্য আমি ধন্য,
জানি ভবলীলা সাঙ্গ হলেও তুমি আমার জন্য।

এবারেও

- শীতল চট্টোপাধ্যায়

বাঁধতে-বাঁধতে পুজো প্যান্ডেল উঁচু হয় বেড়ে যায়
হাসপাতালেও কোভিড শয্যা ভয়েতে বৃদ্ধি পায়।
পুজো খুশি থাক, সাথে ভয়ও, এবারেও চাই এটা
প্রতি মানুষই সাবধানে, থাকলেই ভালো যেটা।
মানুষ ভোলে না যেন, পুজোতেও মহামারী
সুযোগ পেলেই বাড়াবে কোভিডও শক্তি তারই।
বাঁচার নিয়ম সবাই নিজে - নিজে মেনে নিলে
পুজোর খুশি ছড়াবে আকাশের মতো নীলে।
পুজোতেও চাই নতুন মাস্ক মুখ থাকে যাতে চেপে
ক্ষতি নেই যদি ঠাকুর দেখা হয় দূরত্ব মেপে।
মর্ত্যের মহা অতিমারী খবর দুর্গা জানে
বাপের বাড়ির ডাক তবুও রোজই শুনছে কানে।
রাজপথে আসা দুর্গার শহরে প্রাসাদ- বাড়ি
গ্রামেতে দুর্গা আলপথের কাশ মেখে দেয় পাড়ি।
দিকে- দিকের দুর্গাকে সাবধানে যেন রাখি
একসাথে ভিড় বাড়িয়ে করবো না মাখামাখি।
নির্বিষ গড়া পরিবেশে বলব- দুর্গা এসো
মানব তুমি ও আমরা দূরে থাকা নির্দেশও।
দুর্গাকে ভালো রাখতে মনেতে মনটা খুঁজো
এভাবে ভয়টা হেরে খুশিতে আসবে পুজো।
এবারেও তুমি এসে দূরে - দূরে থেকো মা
তুমি ও আমাদের -এ দূর, গড়েছেও করোনা।

প্রায়

- শীতল চট্টোপাধ্যায়

কুমোরটুলি, কৃষ্ণনগর, আরও অনেক জায়গার মৃৎ দুর্গারা
কোভিড তালিবানি ফতোয়ায় বের হবেনা প্রাণ ভয়ে।
অনেক দুর্গাই পৃথিবীতে এলো না, মর্ত্য স্পর্শ হলো না।
কোভিড মহামারীর উন্মত্ত তালিবানি ইচ্ছায়
প্রাণ হরণের আতঙ্কে, ক্লাব-পাড়ার অনেক চেনা ঘরেই
থেমে রইল, দুর্গার আসার- আশা।
পুজোর স্বপ্ন বাঁচানো মৃৎশিল্পীর শিল্প সার্থকতা
কেড়ে নিয়েছে মহামারীর সংক্রমনী ঢেউ,
স্রোতহীনে বন্ধ হয়েছে প্রাণের উৎসব উৎস।
লুঙ্গি পরা খালি গায়ে মোটা কাচের চশমা চোখে দিয়ে
উদাস তাকিয়ে, উৎসব উপোসি প্রবীণ মৃৎশিল্পী,
মা বা কন্যা হয়ে, দুর্গা যাদের এনে দিত অর্থ সুখ।
দুর্গাকে হৃদয় অলংকারে সাজিয়ে তোলার
সর্বস্ব নিঙড়ানো শিল্পী সত্তার মূল্যায়নের মর্যাদা জুটলনা এবারেও,
দুর্গা সান্নিধ্য না পেতে দেওয়ার
অভিশপ্ত কোভিড তালবানি হুঁশিয়ারিত
তারা কর্মহীনে হতাশা আক্রান্ত, অর্থহীনে উপোস আতঙ্কে শঙ্কিত,
পুজোর দুর্গাকে সৃষ্টি করতে না-পারার
কাতরতা , যন্ত্রণা, শৃংখলতার বঞ্চনায়
শিল্পী নিজেই প্রানের মানুষ থেকে প্রায় প্রানহীন মূর্তি হয়ে গেছে।

কাশফুল

- অন্নপূর্ণা ঠাকুর চক্রবর্তী

অলকেশ দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে। মাটির বাড়ি, সুন্দর সাজানো সবুজে ভরা গ্রাম দেখে ভীষণ ভালো লাগল।
ভোরের আলো ফোটার আগেই বন্ধু ও তার বোন টুকি, ওকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে তাদের সবুজে ভরা গ্রামখানি, ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে, দেখাতে, দেখাতে, একটু দূরের এক জলার ধারে নিয়ে এলো।
টুকি, অবাক করে বললো,
ওই দেখুন কাশফুল;
তখন সবে সূর্যের আলো ফুটেছে আকাশে।
এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যেন নিজের অজান্তেই টুকির হাতটা ধরেছে অলকেশ।
উনিশ বছরের টুকি হঠাৎ শিহরিত হয়ে উঠলো এই প্রথম কোনো অজানা পুরুষের স্পর্শে।
এরপর ওরা একটা ছোট্ট ডিঙি করে ঝিলের ওপর ঘুরে বেড়ালো। প্রভাতের আলোয় চারিদিকের মনোরম দৃশ্য অলকেশ মুগ্ধতায় ভরে উঠল, গ্রামের সরল পরিবেশ দেখে। ডিঙি থেকে নামবার সময়ে আবারও টুকির হাতটা নিজের মুঠোয় চেপে নামালো। টুকি লজ্জায় মুখ নিচু করে বাকি পথটা বাড়ি ফিরল।
দুপুরে খাওয়ার সময়েও টুকি পরিবেশন করল মিষ্টি হাসিতে আড়ে আড়ে চেয়ে।

অলকেশও চুপিচুপি নিরীক্ষণ করল মুগ্ধ হয়ে।
বিকেলের আলোয় আবার দুজনে সেই কাশের বনে ঘুরতে গেল। বন্ধু তখন ছিল না। একটা লাল শাড়িতে টুকিকে বালিকা বধূর মতো দেখাচ্ছে।
বিকেলের আলো আবছা হয়ে আসছে ক্রমশ। টুকি এবং কাশবন দুটোই অলকেশকে আবৃত করেছে। অলকেশ হঠাৎ টুকির গালটা টিপে দিয়ে বলল, আই লাভ ইউ।
টুকি অলকেশের হাতের চেটোয় নিজের হাতটা রাখল সন্তর্পণে। ভালো লাগার অনুভূতির পরশে জীবনে নতুন রঙ লাগলো। দুদিন বাদে অলকেশের বিদায়ের গাড়ির সিগন্যাল বেজে উঠতেই, টুকির হৃদয়ে কম্পন হলো অনিবার্য কারণে।
অলকেশ যাবার সময়ে টুকিকে বলে গিয়েছিল আবার আসবো! পরবর্তী কালে টুকি পথের পানে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিল অবিরাম।
এখনো শরতের বাতাসে কাশবন একই রকম দোল দিয়ে যায়।।

পিপাসা

- সুচন্দ্রা বসু

বৌদি, ঘর পরিষ্কার করছিল পুজোর জন্য।
বললাম, চট করে আমায় এক কাপ চা করে দাও।
বলল হ্যাঁ এই মাকড়সাগুলো কত মারাত্মক তা জান? কাল ঘরের ঝুল পরিষ্কার করেছি।আজ আবার ঘর ভর্ত্তি মাকড়সায় জাল বুনেছে।
মাকড়সা তার দারুণ আতঙ্কের।
বললাম এতো ভয় পাও মাকড়সাকে?
পুজোর সময় নাই বা ওদের প্রাণ নিলে।থাক না ওরা।ওই তো ক্ষুদ্র আট পায়ের জীব।তোমার তো তেমন ক্ষতি করছে না আর।
ভিডিওটা দেখলে অবাক হয়ে যাবে তুমি।
_বৌদি কৌতূহল বশত চোখ নাচিয়ে জানতে চায়ল কি ভিডিও ঠাকুরপো দেখি?
অবাক,হয়ে দেখল
একটি কাঠের বিম থেকে ঝুলন্ত অবস্থায়, কিভাবে'হাউস রেন' নামে চড়াই পাখির মতো একটি ছোট পাখিকে পা দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে লোমশ ক্ষুদ্র প্রাণীটি।
ভয়ঙ্কর লোমশ প্রাণীটি তার শরীরের সমস্ত রস চুষে খাচ্ছে। ক্ষুদ্র প্রাণীটি ট্যারান্টুলা প্রজাতির মাকড়সা। সত্যিই একটি আস্ত পাখি গিলে খাচ্ছে আটপায়ের লোমশ একটি ট্যারান্টুলা মাকড়সা।

https://www.shabdodweep.co.in

বললাম, ট্যারান্টুলা প্রজাতির মাকড়সা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। তাদের কামড় বিষাক্ত হলেও তা বিশেষ ক্ষতি করে না।

পিঙ্ক-টোড ট্যারান্টুলা সাধারণত পাখি খায় না, এরা শিকারের শরীর থেকে রস শোষণ করে হাড়গোড় যা থাকে তা ফেলে দেয়। টিকটিকি, ব্যাঙ, ইঁদুরই এদের প্রধান শিকার।

পিঙ্ক-টোড ট্যারান্টুলা গাছে বসবাস করে। তাদের পায়ের শেষের অংশ কিছুটা গোলাপী বর্ণের হওয়ায় পিঙ্ক-টোড ট্যারান্টুলা বলা হয়। ব্রাজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশের রেইন ফরেস্টে এদের দেখা যায়।

বৌদি বলল ভয়ঙ্কর মাকড়সাটা কিন্তু খুব সুন্দর।

হেসে বললাম সৌন্দর্যের ভিতরেই তো বিষ লুকিয়ে থাকে। বৌদি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, মনে মনে ভাবল ভাগ্যিস ঘরের মাকড়সাগুলো ট্যারেন্টুলা নয়। চা শেষ করে

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম দারুণ চা টা করেছো মাইরি।বৌদি হেসে বলল, পিপাসা পেলেই চলে এসো আর কি।

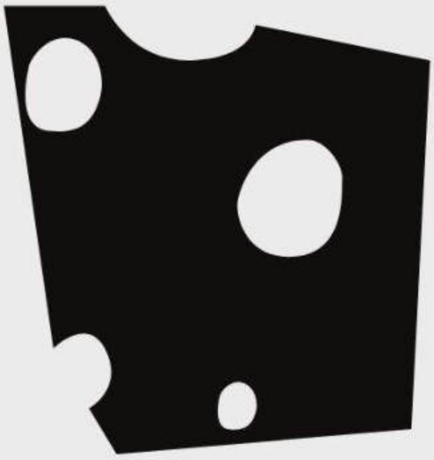

উড়ে গেল বিবেক

- অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

কালি নগর মধ্যপাড়ায়, দূরে ইস্কনের চূড়া
পাশ দিয়ে প্রবহমান আদি অনন্ত জলধারা
এক সন্ধিক্ষণের বিকেল ও রাত্রির মাঝে
ক্রমে ক্রমে মেঘ বিন্দু আকাশ জুড়ে...
শুরু শব্দহীন ঝড়, ওলোট পালোট
হয়ে যাওয়া এই চরাচর, বৃষ্টি পতনের দৃশ্য
মোবাইল স্ক্রিন অন করতেই
এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ল বর্ণমালা
ভেঙে যেতে লাগল বটগাছ
সবাই যেন আশ্রয়হীন, আবার খুঁজতে লাগল
পাখিদের মতন কয়েকটা ডাল পালা
যেখানে বিবেক ও মেরদণ্ডটা শক্ত
কিন্তু সে তো মরীচিকা.........

উড়ে যেতে থাকল বিবেক দূরে-
কোন নীহারিকায়......

https://www.shabdodweep.co.in

বকুল ভূমি

- অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

বকুল ভূমি জুড়ে কুসুম রাঙা কিরণবেলা
দূরপথে বসে আছি সমস্ত সত্তা নিয়ে
সন্ধ্যা আলোয় মেশে জোনাকি মিছিল
আর ঝিঁঝিঁ সঙ্গীতের কলার টিউন
প্রণয় আবেগের হিল্লোলে তৃণভূমি
প্রান্তহীন আকাশময় নক্ষত্রবীথি
শূন্য আলপথ জুড়ে কামিনি সুবাস
কে যেন অনুপ্রস্থ ভাবে রেখে গেলো দৃষ্টি
এখানে বাদল বাতাস বড় বোহেমিয়ান
ভেঙে ফেলে দেয় হৃদয় অরণ্য
উড়িয়ে দেয় অচেনা আকাশপথে
ঠিক ওড়না মেঘের মতো....

সুদৃশ্য বাতাবরণ

- ইন্দ্রাণী সরকার

বকের ডানায় উড়ে যায় কালকের দুঃস্বপ্ন,
অবিচ্ছিন্ন ত্রাণ নিবিড় হয়ে জড়িয়ে ধরে।
অন্ত্যমিলের পালক উড়ে আসা স্তব্ধ হয়,
পংক্তি পাল্টে পাল্টে শুনি জমাট বেদনার
পাহাড় কেটে স্বচ্ছসলিলা নদীর কলতান।
অনায়াসে মিশে যাই অতল গভীরে তার,
সে বাতাবরণ স্নেহের ছায়ায় ঘিরে রাখে
তার ভিতর ভরে থাকে কেমন উজ্জ্বলতা।

বাসনা রোদন ছড়ায়

- জগদ্বন্ধু হালদার

আজ অবধি জানাই হলো না আমার
কী উষ্ণ আবেগে পুঞ্জীভূত মেঘমালা
নিঃশব্দে ঝড় তোলে বুকের ভেতরে
কী নিবিড় বিশ্বাসে বলিষ্ঠ ইচ্ছেরা
স্পর্ধায় মাথা তোলে বন্দী মৃত্তিকায়
কী অবিশ্বাস্য প্লাবনে প্লাবিত হয়
চৈত্রের চৌচির জনপদ;

কৃষাণের শানানো কাস্তে আর লাঙ্গলের ফলা
প্রতিদিন কত শত বন্ধ্যা ভূমিতে
জীবন ও যৌবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে
রাশি রাশি ধানে ভরে দেয় আঙ্গিনা;

অথচ আমার শ্রমের ফসল
হৃদয়ের সবুজ বৃন্তে লালিত ভালোবাসা
কতো সযত্নে লুকিয়ে রাখতে হয়
বৃক্ষের মুকুলে;
অবিরত মেঘনার কালোজলে ভেসে যায়
পোয়াতি আবেগ; আর্ত বাসনা
রোদন ছড়ায় ফসলের বিছানায়।

কী এমন দুঃখ তোমার

- জগদ্বন্ধু হালদার

এখনো রয়েছে অনেক বেলা বাকি
তোমার পথের ধারে ঘাসফুল এখনো বিমলিন
দূরাকাশে রঙ্গিন মেঘ খেলছে আপন খেলা
কী এমন তাড়া তোমার, থেকে যাও এই বেলা

কী এমন দুঃখ তোমার
সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে যেতে চাও দূর বনে একা একা
পৃথিবীর এই সব ছোট ছোট ভালোবাসা তুচ্ছ করে
কুলকুল বয়ে চলা মেঘনা যমুনা ছেড়ে
মদির জ্যোৎস্না মাখা এই রাত দূরে ঠেলে ফেলে
কোথায় পালাতে চাও?

চেয়ে দেখো বৃক্ষের মুকুলে ক্রমাগত বেড়ে ওঠার কী উন্মাদনা
চেয়ে দেখো শ্রাবণের নিদারুণ প্লাবনে স্বপ্নগুলো ভেসে ভেসে যায়

তবু মানুষ! আহা মানুষ!
ছেঁড়াপালের নৌকোর হাল ধরে বসে থাকে
বসে থাকে এক বুক আশা নিয়ে সুখের প্রত্যাশায়।

কৌণিক নদী

- মহাজিস মণ্ডল

দোষে-গুণে ভরা আমাদের জীবন
আলো-অন্ধকারে প্রতিদিন পথ হাঁটতে হয়।

একটা বাঁকের পরে আরও একটা বাঁক থাকতে পারে
আবার কখনও পথ চলে যায় সোজা সটান
মেঘের আড়ালে কেউ মুখ লুকিয়ে থাকে
কেউ বা আলোর মতো হাসে চারপাশে।

কিছু ক্ষয় কিছু বা ক্ষত দাগ
স্মৃতি চিহ্ন বুকের গভীরে মায়াজাল বুনে
তবুও সবুজ পাতার অক্ষরে ঝরে রোদ
আর অনন্তধারায় বয়ে যায় জীবনের কৌণিক নদী...

পৃথিবীর অভিনয়

- বারিদ বরন গুপ্ত

চলতে-ফিরতে পথে
হাজার মানুষ ছুটে আসে,
বুকে জড়িয়ে ধরে,
মন কেড়ে নেয়
আনমনা হয়ে যায়!
ভালো লাগে ভালোবাসি তাই,
মনে হয় পৃথিবীটা আমার।

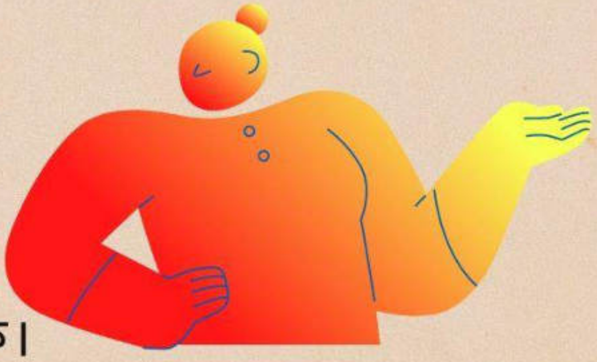

অচিরেই ভুল ভেঙে যায়
ধীরে ধীরে সব সরে যায়
দূরে দূরে---------বহুদূরে
অবাক নয়নে চেয়ে থাকি।

অবুঝ মন কেন বোঝেনা?
কেবল খোঁজে সবুজ ঠিকানা!
বারে বারে পিছু ডাকে
ফিরে তাকিও তাকায় না।

প্রেমহীন প্রাণহীন পৃথিবী
একি তোমার ছলনা!
তোমার অভিনয় বুঝেও বুঝি না
মন খুঁজে মরে সবুজ ঠিকানা।

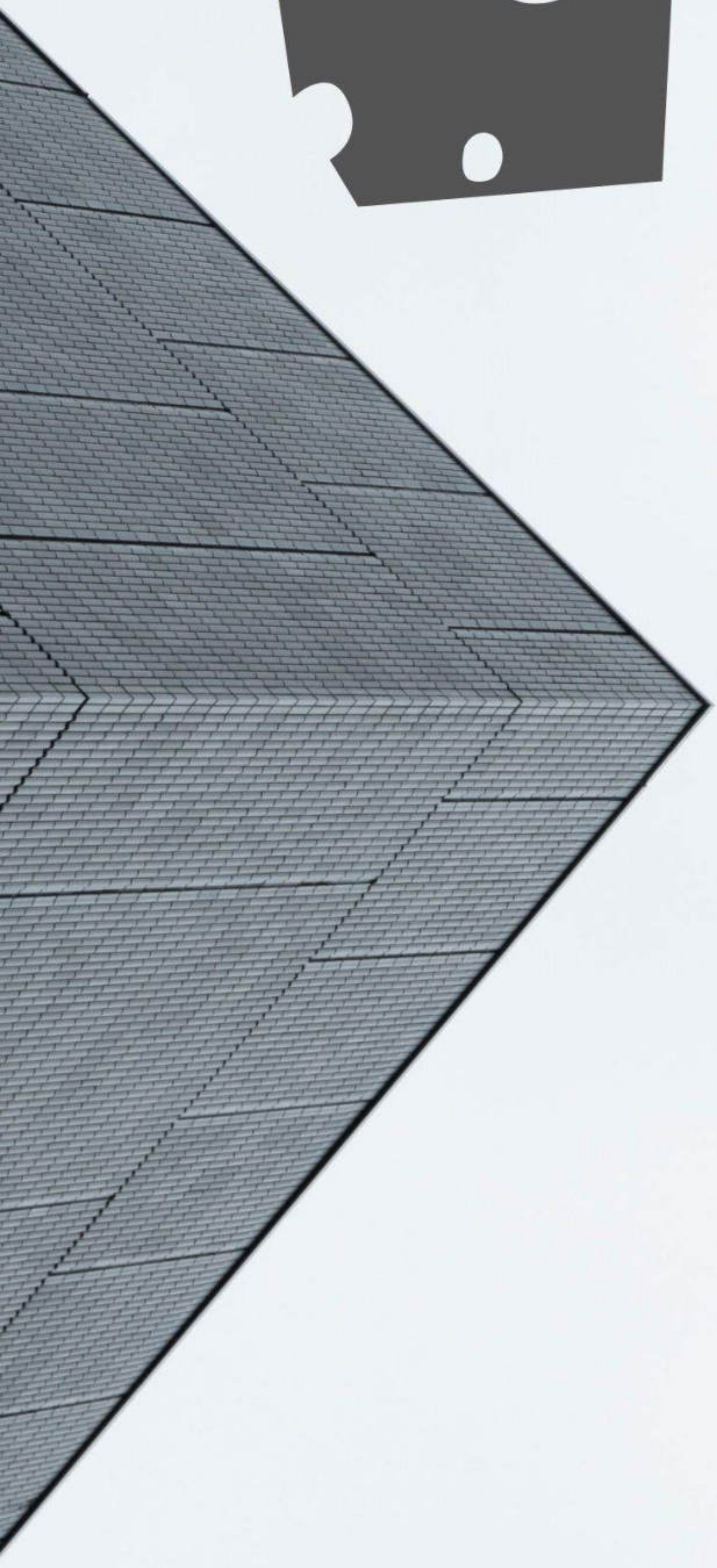

রুদ্র - বৈশাখে

- মহুয়া ব্যানার্জী

উড়ল আঁচল বৈশাখী ঝড়ে
আগল ভাঙে মনের ঘর।
রুদ্র তোমার প্রখর ছোঁয়ায়
শরীর ভরা প্রবল জ্বর।
সর্বনাশের নেশায় আকুল
খেলছে বাজী মরণপণ।
মত্ত মাতন লাগল হাওয়ায়,
ফুৎকারে তার সব উচাটন।
ভাঙার ঝোঁকে পুতুল গড়া
সংসারেতে সং সাজা-
ফকির তুমি নিঃস্ব তাপস?
আসলে তো তুমিই রাজা।

শিল্পসম্মত

- মহুয়া ব্যানার্জী

কাঠফাটা রোদ্দুরে মাথায় কাঠের বোঝা
নিয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটছে কালো যুবতী।
কাঁখে কলসীর মত ঝুলছে অপুষ্ট শিশুটি-
অনাবৃত স্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে খিদে মেটানোর
ব্যর্থ চেষ্টায় মাঝে মাঝেই কেঁদে উঠছে।
এদিকে চিত্র প্রদর্শনীতে তার ছবিটা চড়া
দামে বিক্রি হয়ে গেল...
শিল্পী আজ সন্মানিত দেশে বিদেশে।
মহুয়া নেশায় চূর মরদের গা ঘেঁসে
সেই যুবতী আরও একটা শহরের
বাবুর অপেক্ষায় নিজেকে সাজায়।
কবি বা শিল্পী সৃষ্টির দাম উসুল করে নেয় -
অন্ত্যজ মাতৃত্ব শুধু বোঝে খিদে আর
তার অবোধ শিশুটির হাসি অথবা কান্না।

একলা জীবন

- অজয় শীট

সবাই বলে একলা থাকা নয়কো মোটেও সোজা।
বলবো আমি, একলা থাকায় রয়েছে অনেক মজা।
মনের মধ্যে ভাব তরঙ্গের উঠে যখন ঢেউ।
বার বার বলবে ,তোমায় হারাতে পারবে না কেউ।
দুঃখের ওই উপত্যকায় যাবে যখন চলে।
একাকিত্ব শক্তি যোগায়, সত্য কথা বলে।
মনের মধ্যে দুঃখ নিয়ে থাকবে তুমি বসে।
আসবে না কেউ তোমার কাছে, দেখবে হেসে হেসে।
একলা জীবন মানে শুধু কষ্ট পাওয়া নয়।
নিজের সাথে লড়াই করে কাটাতে হয় ভয়।
একা থাকা মানেই সব হয়না যে শেষ।
শক্তি আসে নিজের মনে,
দেখবে, জগৎটা লাগছে এবার বেশ ।
পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ানো, শিখবে একা থেকে।
হারাতে পারবে না কেউ তখন তোমাকে।
একাকিত্বকে সঙ্গী করেই এগিয়ে যেতে হবে।
তবেই তো একদিন সাফল্য খুঁজে পাবে।

শ্যাওলার অভিযোজনে রাত্রিকালীন সংলাপ
- সুনন্দ মন্ডল

রাত বাড়লেই শ্যাওলার আস্তরণ
শরীরের প্রতিটা লোমে,
জমে থাকা ঘামে।
পরিশ্রম লেগে থাকে
রোদজলা দিনের পোশাকি আহ্বানে।

তুমি নেই বলে কি উৎসব হবে না !
তুমি আছো বলে কি উৎসব?
জীবনের প্রতিটা রঙের দায়ভার কি তোমারই!
সব রঙ ধুয়ে কালোকেই মাখবো তবে।

হাজার কাজের ফাঁকে
শ্যাওলার অভিযোজন বাড়ে রাত্রিকালীন সংলাপে
ফুটে ওঠে জলীয় চিঠির দেয়ানেয়া
এক উৎসব থেকে আরেক উৎসবের পিঠে।

অব্যক্ত নিষেধ !

- সুভাষ কর

বিশ্বাসবাড়ীর যৌথ-পরিবারের পরিচারিকা মালতীমাসীকে পাড়ার সবাই চিনত। টানা চল্লিশ বছর বাড়ীর ছোটরা এই 'মাসী'-র হাতেই বড় হয়েছে। পাড়ার বাকী ছেলেমেয়েদের এমনকি দোকানদার, ফেরিওয়ালা, সাফাইকর্মীদেরও সে ছিল 'কমন' মালতীমাসী।

বিশ্বাসবাড়ির কাছেই একটা দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে মালতীমাসী বছরদশেক হ'ল দেশের বাড়িতে। গৃহকর্তার তরফে অনেক ব্যয়বহুল চিকিৎসায়ও মালতীর কর্মক্ষমতা ফিরে আসেনি। গৃহকর্তার মৃত্যুর পর মালকিন-দিদি দীর্ঘদিনের সংসারসঙ্গী এই বোনটির দায়ভার আর নিজে রাখতে সাহস করেনি। তবে মালতীমাসীর যত্নাদিতে বড় হওয়া এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা আজ সবাই-ই প্রতিষ্ঠিত। এতদিন ধরে এরাই সবাই চাঁদা তুলে দেশের বাড়িতে মাসীর চিকিৎসা চালু রেখেছে; এখনো নিয়মিত একটা মোটা মাসোহারা পাঠিয়ে যাচ্ছে। তাইতো পা টেনে চলা পড়ন্ত জীবনটা আজো কোনোভাবে চলছে মাসীর!

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। দু'বছর আগে প্রয়াত 'মালকিন-দিদি'র ছোট মেয়ে সহেলীর আজ বিয়ে। ফোনে মালতীমাসীর সাথে সহেলীর নিবিড় যোগাযোগ। আপ্লুত স্বরে মাসী শুধু বলতেই থাকে "তোদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই"। সহেলী কোনভাবে মাসীকে নিরস্ত করে। মায়ের অভাব কিছুটা ভুলতে সহেলী কতকটা ঝুঁকি নিয়েই বিয়েতে মালতীমাসীকে নিয়ে এসেছে। এ নিয়ে কম কথা উঠেনি। যাই হোক, মঙ্গলমতে বিয়ে শেষ হলে সবার চোখে পড়ল- নব বরবধূ একসাথে এসে হুইল চেয়ারে বসা মালতীমাসীকে প্রণাম করছে। মালতী সসংকোচে বলে উঠে, "থাক, থাক, উপরওলা তোমাদের দু'জনকে খুব সুখী করুক"। পরক্ষণেই সহেলীকে উদ্দেশ্য করে বলে, "একবার সুযোগমতো জামাইসহ আমাদের গাঁয়ে আসবা য্যান"। কথাটাতে অপত্য স্নেহের এতটুকুও অভাব ছিল না, তবু হঠাৎ এই 'তুমি' সম্বোধনটায় সহেলীর কানে যেন একটা ব্যতিক্রমী সুর! বাচ্চাদেরকে সহজ সরলভাবে 'তুই' সম্বোধনে কাছে টানার সেদিনের পুরনো, স্বাভাবিক এবং অনুমোদিত অভ্যেসটায় আজ বোধহয় স্বেচ্ছায়ই লাগাম ধরল মালতীমাসী। কিন্তু কেন? কুটুমমহলের বা বহির্সমাজের কোনো অব্যক্ত নিষেধেই কি?

https://www.shabdodweep.co.in

রূপসী ডুয়ার্স

- নিতাই দাস

আদি অনন্তকাল থেকে হেঁটে চলেছি,
পৃথিবীর হাত ধরে,
পথে-প্রান্তরে ।
জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত,
এই গতির শেষ নেই,
ক্লান্তির বিরাম নেই ।
মানুষের কালের চাকা ঘুরেই চলেছে,
ঋতুর অমোঘ নিয়মে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা ,বসন্তে ।
আমার দু পা দু- দন্ড দাঁড়ায়নি,
ওই নদীর ধারে,
দেখেছিলেম রূপসী ডুয়ার্স।
সবুজ দ্বীপের দেশে পাহাড়ের কোলে,
আঁকাবাঁকা পথে,
জীবনের সমুদ্র সফেন ।
দিবসের বিদায়বেলায় সন্ধ্যে নামে,
জোনাকির মেলায়,
কেনাবেচা হয় আলো।
ফুরায় এ জীবনের হিসেব নিকেষ,
চারিদিকে ঘন অন্ধকার,
দেখেছি রূপের অরণ্যানী।

https://www.shabdodweep.co.in

বনমল্লিকা

- নিতাই দাস

তোমাকে
আমি দেখেছিলেম একদিন:
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে-
জনমানবহীন বট - অশ্বত্থের নিকট
তমালের ডালে দুলেছিলে ঝুলনে;
খোলা চুল হাওয়ার আদরে উড়ছে।
কাজল কালো চোখ,
ঠোঁটের কোণে মায়াবী হাসি,
এক চিলতে রোদ্দুরে;
আমার চোখ ঝাপসা!
লাবণ্যময়ী তুমি -তাই চেয়ে আছি;
ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে।
বনের পথ ধরে হাঁটছিলাম খররৌদ্রে,
আমার দু'পা থমকে দাঁড়ায়;
তোমায় দেখে।
দুপুরের বাতাস নিঃসঙ্গতা ভাঙ্গে--
শিষ দিয়ে পাখিরা কথা কয়,
আমার চোখের ভাষা কেউ বুঝল না;
একবারও ফিরে তাকায়নি বনমল্লিকা ।

স্মরণীকা

- বিধান চন্দ্র নস্কর

পরশ পেয়েছে জেনে সময় ঝরিয়ে দিয়েছে
স্থির প্রত্যয়ে ধরা বিদায়ের নীর।
যেখানে যা কিছু ছিল আজও বেদনায় স্থির।

শুধু টুকরো সম্বন্ধ এক অদূরে অক্লান্ত অস্থির।
চির বিদায়ের পর স্নেহের সিন্ধু সেচা
পরশ ও স্পর্শকাতর।
এখনও বলে যায় আকুতির প্রশমিত পথে
বিস্তর প্রকারে নির্বাপিত ক্ষতে।

প্রেক্ষিত পেরিয়ে ধায় আপন সৃষ্টির কিংখাবে।
হৃদিভার নেমে গেছে তবে
যবে অশ্রুধার নিবারিতে পেরেছি যতনে।

তমিশ্রার সমবায় উদ্ভুত আত্মজ চেতনার
অদৃশ্য বন্ধন অটুট আজো সহজ সাধনায় ধিরে
অচিরেই মোহভঙ্গ উচ্ছসিত সময়ের পানে
ধাবিত অতলান্ত অবিশ্রান্ত স্স্মরণিকা চিরে।

কীলক

- বিধান চন্দ্র নস্কর

ভাবনারা ভাসিয়ে নিয়ে যায় আলোকবর্ষে।
অর্ধেক জীবন, তাও থাকবে কী জানা নেই।
তবু পৃথিবীকে কাঁদতে চাই–
কর্তব্যের স্পর্ধিত প্রত্যয়ে।
আবার জীবন আহত না মৃত সেই ভাবনা
বারেবারে ছায়া ফেলে মৃত্যুর কিনারে,
সেইসব রাতভর দাবানল ভাঙা
শুধু ছাই সবুজের, নিহত অজস্র ভাবনার
বহুরাত ধরে কান্নার মতো, কাঁচা কাঠে ঘাম,
মৃতেরাও বোঝে তাদের পরমায়ু শেষ।
স্হির হতে হতে আরো একবার অস্থির হতে
চাই যেমন করে অস্তিত্ব খেসারত দেয়।
আজ হতে বহু যুগ পরে, মধ্যরাতে সর্বনাশা
দিন ; না ঘুমানোর হাই তোলে।
সেই পরম্পরা যাপন, চিত্রিত এক একটা পল্লব
ওঠে পড়ে জানি, শতত প্রবঞ্চনা সয়ে, শয়ে শয়ে
দলিত জীবন একদিন না একদিন
স্থায়িত্ব বুঝে নিতে পারে জানি
তবু ভালোবাসা কি অপরাধ বোঝে?

অঞ্জলি

- সুভাষ নারায়ণ বসু

চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ
বিশ্বকর্মা এসে হাজির
তাই লাগছে না মন্দ ।
শরতের মেঘ ভেসে বেড়ায়
আকাশে কারা ঘুড়ি ওড়ায়
আমরা খুঁজি হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ।
কাশফুলের সমারোহ শিউলির সুবাসে
আগমনীর সুর ভাসে আকাশে বাতাসে
দেবীবন্দনা চন্ডীপাঠ আর ঢাকের তালে
ঐ বুঝি মহালয়া এলো বলে ।
তর্পণ করে পিতৃপক্ষের সমাপ্তি
দেবীপক্ষের শুরু
এবার পুজো কেমন যাবে
বুক করে দুরুদুরু ।
আগমনীর আগমন বার্তায়
অশান্তির কালো মেঘ
সরে যাক একটু একটু করে
অঞ্জলি দেব মাগো
তোমার রাঙা চরণে
সমস্ত মনপ্রাণ ভরে ।।

কালি কলম

- সুভাষ নারায়ণ বসু

হারিয়ে যাওয়া কালি কলম কোথায় খুঁজে পাব
কবিতা লিখতে গিয়ে আজ সবই হারাব ।
মাউসটাকে হাতে নিয়ে যতই করি নাড়াচাড়া
কম্পিউটারের কীবোর্ডে আঙ্গুল চালিয়ে দিশেহারা
যুগে যুগে কালি কলমের হ'ল কতই না রূপান্তর
হারিয়ে গেল সবই বুঝি আজ দেশ থেকে দেশান্তর
ছিল একদিন যখন থাকতো কালি শুধুই দোয়াতে
কলম তৈরী হ'ত খাগের অথবা পাখির পালকেতে ।
বিপ্লব ঘটাতে জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন
কালি দোয়াত কলমকে ছুটি দিয়ে দেন ।
সংমিশ্রণে রূপান্তর হ'ল কালি দোয়াত কলম
হাতে এলো থ্রি ইন ওয়ান হয়ে ঝর্ণা কলম ।
ঝর্ণা কলমও হারিয়ে গেল বল পেনের আগমনে
এসব কথা ভাবি শুধু বসে আপন মনে ।
কম্পিউটারের দৌলতে সবই অবলুপ্তির পথে
সব কলমেরও দিন ফুরালো কালি দোয়াতের সাথে
যুগের সাথে পরিবর্তনের স্রোতে আমরা যাই ভেসে
তবু দেব না হারিয়ে যেতে কালি কলমে ভালোবেসে।

পুজোর আহ্বান

- মুকুল সরকার

ডাকছে আকাশ, শারদ বাতাস
নদীর বুকে খেলে রাজহাঁস।
শিউলি ফুলের গন্ধে মাতি,
পুজোর সময় সবাই সাথী।

ঢাকের তালে কোমর দোলে,
মেঘের ছায়া সাগর জলে।
নীল গগনে সাদা ভেলায়
ঘুরতে যাবো পুজোর মেলায়।

সোনালী রোদে পাখা মেলে
আসবে 'আশা' হেসে-খেলে।
দেখবো স্বপন মনের কোণে,
নাচবো মোরা পুজোর গানে।

ভুলে সকল ঝগড়াঝাঁটি
পুজো হোক জমজমাটি।
মিলবো সবাই মিলন মেলায়,
নাইব মোরা আলোকমালায়।।

আকাশে কাঁটা তার
- পাপিয়া গাঙ্গুলি

গোধূলির রং ছিঁড়ে ছিঁড়ে যে
তার গুলো ছুটেছে
আকাশ আর দৃষ্টির মাঝামাঝি,
তারা সীমানা রক্ষক কাঁটাতার,
শহুরে বিদ্যুতের তার।

আড়ালে আবডালে অদৃশ্য দৈবতা
চলাচল করে এসব তার বাহিত
হয়ে
গৃহস্থের অন্দরমহলে।
তাদের অজান্তেই ভর করে স্বপ্নে
চুপিচুপি ঠিকানা এঁকে দিয়ে যায়
স্বর্গ মর্ত্যের নিশানা উড়িয়ে।
ভবিতব্য দর্শায় মুচকি হেসে।

https://www.shabdodweep.co.in

প্রেম নয় অসহায়

- পাপিয়া গাঙ্গুলি

সবকিছু ছেড়ে এসেছি
সবকিছু ফেলে এসেছি
ট্রেনের জানলা থেকে দেখা
ল্যাম্পপোস্টের মতো।
পেছনে রয়ে গেছে
খুনসুটির মুহূর্ত,
বুকে পাওয়া আশ্রয়
হাতের ওপর হাত রাখা বা
অতর্কিত চুমু।
তবু প্রেম অসহায় নয়,
হাত ধরে থাকে একঝাঁক
সুগন্ধী স্মৃতি।

ঝড় গাথা

- শর্মিষ্ঠা বসু তরফদার

ঐ যে ওরা যাচ্ছে হেঁকে হেঁকে
আসবে নাকি ঝড়ের ঘনঘটা
সবাইকে তাই বলছে ডেকে ডেকে
জামাকাপড় , কাগজপত্র গোটা।

রাতের আগেই ছাড়তে হবে ঘর
কত সুখের গড়া এ সংসার
সর্বনাশা আসবে এমন ঝড়
ওলোটপালোট জীবন ছারখার।

শুধু কি ঝড়, জোয়ার এলো সাথে
গবাদি প্রাণ যায় যে ভেসে কতো
বাঁধ ভেঙে জল ডুবিয়ে দিলো
রাতে
গিললো নদী ভিটেমাটি যতো।

সকাল হলো শরণার্থী শিবির
চারিদিকে জল থই থই নদী
জল নামলে আবার বাঁচার জিগির
দু'মুঠো ভাত ভিক্ষা জোটে যদি।

বছর বছর এমনি করে কাটে
ঝড়ের সাথে ,জলের সাথে লড়ি
বসতবাড়ি, সোনার ফসল মাঠে
হারিয়ে ফেলে নতুন করে গড়ি।।

পথ চলা

- শর্মিষ্ঠা বসু তরফদার

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে
অনেকটা পথ চলা
দুজনে ছিলাম মগ্ন নিজেতে
হয়নি তো কিছু বলা।

জীবনের পথ বন্ধুর, চড়া
হোঁচট খেয়েছি কতো
সামলে নিয়েছি এই ওঠাপড়া
আর হেরে যাওয়া যতো।

তবুও পেয়েছি ভরসা মনে
পথ চলা পাশাপাশি
সান্নিধ্যটাই চাই প্রতিক্ষণে
ভালো তোমাকেই বাসি।।

জন্মদিনের পায়েস

- শম্পা ঘোষ

উফ রোববারের একটা ছুটির সকাল কোথায় একটু বেলা করে উঠবো তা না সকাল সকাল শুরু হল তনিমার আমার মায়ের সাথে রোজকারের অশান্তির নাটক। বাবা মারা যাবার পরে যখন থেকে মা আমার এই বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেছে তখন থেকেই এই নাটকের সূত্রপাত। রোজই কিছু না কিছু বিষয়ের উপস্থাপনা করে তনিমা মায়ের সাথে ঝগড়া করে। যাক আজকের ঘটনার তদন্তে নেমে পড়তে হল। গিয়ে দেখি আমার মা রান্না ঘরের সামনে কেমন অপরাধীর মতো মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই মা প্রায় কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠলো "না রে বাবু! আমি কিছু চুরি করিনি। আমি শুধু একটা রান্না করতে এসেছিলাম। তোর বউ আমায় চোরের অপবাদ দিল রে। বিশ্বাস কর আমি কিছু করিনি"। ওপাশ থেকে প্রায় রে রে করে তেড়ে আসলো তনিমা।" একদম বিশ্বাস করবে না। উনি সাত সকালেই আমার রান্নাঘরের জিনিস চুরি করে নিজের জন্য খাবার বানাচ্ছিল। কেন ওনাকে কি যথেষ্ট খাবার দেওয়া হয় না। তাতে কি পেট ভরে না যে উনি চুরি করে খাবেন। আমি রান্না ঘরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম কি এমন জিনিস যা আমার মা আমারই ঘর থেকে চুরি করে খাবে"।

গিয়ে দেখি মা পায়েস তৈরি করে রেখেছে। ওটা দেখেই আমার হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আজকের দিনটা। আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার। মা আমার জন্মদিনে আমায় পায়েস বানিয়ে খাওয়াতে চেয়েছে। সব বুঝে গিয়ে আমি মায়ের হাত ধরে মায়ের ঘরে যেতে যেতে বললাম "আমাদেরও ছেলে আছে তনিমা । আমার কাছে আমার মা আর তুমি দুজনেই সমান মূল্যবান"। তনিমা আমার কথায় কি বুঝলো জানি না, চুপ করে গেল । আজ অনেকদিন বাদে মায়ের হাতে জন্মদিনের পায়েস খাবো ভেবে আনন্দে চোখে জল চলে এল।

দূরত্ব বনাম

- বদরুদ্দোজা শেখু

দূরত্বে দাঁড়াই, দূরত্বে থাকি
আশপাশের মানুষগুলোকে বুঝা যায় না কিছু
কা'র মধ্যে হিংস্র দুর্বৃত্ত লুকিয়ে আছে ,
কার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের চেতনা শুভবুদ্ধি ভালোবাসা
আপোসহীন, আজকের এই ক্ষুয়িষ্ণু সমাজে
বড়োই দুর্বোধ্য সবকিছু, কাজেকাজেই
দ্বিধায় থাকি সংশয়ে থাকি, দূরত্ত্বে থাকি, সাংসারিক বা ব্যক্তিগত
কাজকর্ম যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারি
সংসার তো এক অনুপেক্ষনীয় মায়াবী মুলুক,
তাই ঘাস-কাটা থেকে উচ্চবৃত্তি শিক্ষিত সভায়
যেতে হয় ভীষণ একাকী মান-সম্মান ধর্মাধর্ম ইজ্জতকে
বন্ধক রেখে কোনো এক ঈশ্বরের কাছে , যদিও বিবিধ
ঈশ্বরের নামে সর্বদা হুজ্জুতি বাধে, প্রকাশ্য রাস্তায়
রামদা ঘুরিয়ে প্রগতিবাদের কি ক্ষমতাবাদের কল্লা কাটে
সমস্ত ধর্মান্ধ মানুষ, জাতপাতের ঘুণপোকারা ওতেঘাতে
অথবা প্রকাশ্যে ঘৃণার মজ্জা চাটে, চৌকাঠে ঘুমিয়ে থাকে
বিভেদের চোরাবালি,খুনী ধর্ষকের হেঁয়ালি,নারীপুরুষের ঘর-গৃহস্থালি
আচমকাই হিংস্রতার বলি হ'য়ে যায়, হায়
দূরত্ত্বে থেকেও কি নিরাপদ কেউ আমরা
অহিংস সহাবস্থানে বিশ্বাসী সাধারণ ছা-পোষা মানুষ ??

ধাঁধাগলি

- বদরুদ্দোজা শেখু

সকলেই চ'লে যায় সময়ের ডাকে
বিধাতাকে কিছু বলার নাই
সময়ে কি অসময়ে মনোভূমি ঢাকে
সাময়িক বিচ্ছেদ বেদনায়

চাওয়া না-চাওয়ার কোনো
অবকাশ এখানে নাই
শুঁড়িপথগুলো সরীসৃপ গ্রীবায়
বড়ো রাস্তায় মিশে যায়।

অনাহারী অসুখের আচমকা ঘোর
আতঙ্ক বাড়ে ধীরে
কবরতলার খাঁখাঁ বিদেহী নিথর
প্রসঙ্গ ধরে ঘিরে

চিন্তাসূত্র সব এলেবেলে বানে
জোরসে ধাক্কা খায়
পা চালাই আরো দ্রুত,--- আসলে সবাই
ওই তমসা ভুলতে চায়

প্রিয় রূপকথাগুলো মনে মনে বলি
তা যতোই অলীক হোক
ভালবাসি অকপটে অন্ধ ধাঁধাঁগলি
এই বিষয়ী মর্ত্যলোক

রাধাচূড়া অথবা বৈরাগ্য ঔরস

- নিমাই জানা

রাধাচূড়ায় বৃষ্টি এলে আমি কখন ঘূর্ণাবর্ত নদীতে স্নান করি,
বুকের ভেতর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের শিউলি হাসতে থাকে
বৈরাগ্যের সালোয়ার কামিজ
তুমি কামিজের তলায় রাত্রিকালীন নামতা পড়ছো অহেতুক
জীবনচক্র দিয়ে, চোখে এক্সপোনেনশিয়াল থিওরি

গন্ধময় সংসারে আমি তুমি একসাথে পাড় ভাঙ্গা নৌকার গল্প করি
এমন অমোঘ চাঁদের সাথে
কেবল ওই বাতিঘরের কাছে রেখেছি আমাদের অলীক কল্পনা আর
সব জারজ কথাবার্তাকে
রাত্রিটি উপুড় হলেই অমৃত ও বিষ পাশাপাশি তরল মোমবাতি হয়ে
যায়

তুমি বুক খোলা দিগন্তের গোলাপী মৃত্যু রেখে এক স্নিগ্ধ দুপুর হয়ে
গেছ কাল্পনিক রেখার উপর
তোমাকে সম্প্রসারণ করি আগুনের মতো মিথাইল অরেঞ্জ ঠোঁটে,
বিলীয়মান রঙের জাহাজে পাড়ি দেই আমি,
এসো আমাদের কালো নৌকাটির আজন্ম কালের জন্মদিন পালন
করি গর্ভগৃহের ভেতর

কৃষ্ণ কথার মতো লুকিয়ে রাখি আমাদের এই দেহঘর আমি নিজেকে
উপড়ে দিচ্ছি ধূসর মূলরোমের ভেতর,
বৈকুণ্ঠের নীলাভ পুরুষেরা দোতারা বাজায় কালীদহের খেয়াঘাটে।

ঈশ্বর অথবা ভিনিগার কথা

- নিমাই জানা

রাধাচূড়ায় বৃষ্টি এলে আমি কখন ঘূর্ণাবর্ত নদীতে স্নান করি,
বিষ নয়, আগুন অথবা পলিয়েস্টার জামার দীর্ঘ অনুর্বর বুকের ফিতেরা
বৃষ্টির কাছে ছটফট করে নিরানন্দ লোমকূপের কথা বলি
পাশবালিশের ঠোঁটে
এক বুক জলে নেমে ছেঁড়া জামার বোতাম জ্বর মাপে আমাদের অলীক ঈশ্বর

ঘুমের ঘোরে ট্রাঙ্গেল শাড়িটি ভূগোলের বদ্বীপ থেকে নেমে এসে দাঁড়ায়
ফিজিক্যাল সায়েন্সের নিরাময় চ্যাপ্টারে,
পাশাপাশি বসে পড়ি চন্দন গাছের নিচে, বনমালী,
তুমি কি জানো আগুন আর তোমার কোনো স্বাদ নেই এই মধ্যরাতে

তুমি এই ফাঁকা করিডরে দাঁড়াও, দেখো তোমার কৃষাণীকে,
জমাট ভাতের কণা নিয়ে তোমার নৈবেদ্যের পাহাড় বানায় দুহাতে
ভূমধ্যসাগরীয় প্রবাল আর গভীর রাতের রসায়ন চক্র ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে
ভিনিগার তরল প্রেম আর রক্তজালকে

https://www.shabdodweep.co.in

বাবা কখনো কখনো ঈশ্বর অথবা বেল পাতার মতো শ্বেতাঙ্গ
জোনাকি হয়ে যায়
তিনটি বাহু প্রসারিত তিনটি প্রাচীন জানালার দিকে
আমি তার পায়ের কোঁচকানো চামড়ার নিচে ডিভাইন ক্লোরোফর্মের
গন্ধ পাচ্ছি

উচ্চ রক্তচাপের সাংখ্যমান জানার আগে আমার রান্নাঘরের কৌণিক
মানচিত্রের ভেতর
ছোট ছোট কাঁকড়া বিছানায় ছটফট করছে নরম সাপ হয়ে
কৃষ্ণ সারথির দেহখানি গরম উনুনের ঘামের জলে স্নান করলেন,
কুরুক্ষেত্র এখনো পড়ে আছে।

অন্তর্দহন

- মানসী গাঙ্গুলী

অল্পবয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র ছেলেকে আঁকড়ে বাঁচতে বাঁচতে কবে যেন ছেলেকে নিজের কুক্ষিগত করে ফেলেছেন বিমলা। ছেলেও মা অন্তঃপ্রাণ। সেই ছেলে বড় হয়ে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে আনায় বিমলা অতিশয় ক্ষুণ্ণ। যত না ছেলের ওপর তার থেকে বেশি তার বউ রুমার ওপর, যেন রুমা তাঁর ছেলেকে বশ করে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

রুমা মেয়েটি বড় ভালো, তাঁকে বেশ আদর যত্ন করে। তাই বিমলারও তার প্রতি ভালবাসা জন্মালো অচিরেই। কিন্তু ছেলের পাশে রুমাকে দেখলে বা তার সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই বিমলার সহ্য হত না। ওরা একসঙ্গে ঘুরতে গেলে বিমলা হাসিমুখে তাদের সামনে খুশি দেখান কিন্তু ভেতরে শুরু হয় জ্বলন। ওদের মধ্যে ভালোবাসাবাসি তাঁর সহ্য হয় না,   রাগারাগি হলে মনে মনে বেশ খুশি হন। মুখে সামনাসামনি ছেলেকে বকেন, রুমার পক্ষ নেন যদিও।

বিমলাদেবীর ছেলে সুমন বউকে যথেষ্ঠ ভালোবাসে কিন্তু সারাদিনের পর অফিস থেকে ফিরে তাকে কারো সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেখলেই খুব বিরক্ত হয়। একদিন সুমন অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফেরে, সেসময় রুমা তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল ল্যান্ডফোনে। সুমন এসে পড়ায় চট করে ফোন কেটে দেয়। তাতে সুমনের সন্দেহ হয়, ও কার সঙ্গে কথা বলছিল সুমনের না থাকার সুযোগে। বিমলাদেবী সবই জানতেন। তিনি রুমার কাছেই ছিলেন কিন্তু সত্যিটা ছেলেকে বলেন না। দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি বাধে এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। একেই অফিসে বসের সঙ্গে প্রচন্ড ঝামেলা হয়েছে সেদিন, চাকরিটা হয়ত ছাড়তে হবে। এমতাবস্থায় অবিশ্বাস চরমে উঠলে রাগের মাথায় রুমার রগে কষে এক চড় মারলে রুমা ঘুরে পড়ে আর ওঠে না। সুমন ঘাবড়ে যায়, এরপর ডাক্তার-হাসপাতাল, থানা-পুলিশ, জেল। আজ সুমন জেলের ঘানি টানছে, রুমা পরপারে, একা ঘরে অন্তর্দহনে বিমলা।

বাড়তির গুরুত্ব

- ডঃ রমলা মুখার্জী

তনয়ার পরামর্শে গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে তমাল কলকাতার সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে, সেখানে কিন্তু তাদের বৃদ্ধ বাবা-মার জায়গা হয়নি। তাই বাড়তি বাবা-মায়ের আশ্রয় হল বৃদ্ধাশ্রম।

উদীয়মান কন্ঠ-শিল্পী তনয়ার তো গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। কত স্তাবকের দল তাকে ঘিরে থাকে। গীতিকার, সুরকার, সংগীত-পরিচালকদের নিয়েই সে ব্যস্ত, এমনকি ছেলেটাকেও তনয়া আজকাল সময় দিতে পারে না।তাকে বড় কোনো বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেবে তনয়া সামনের বছর।

হঠাৎ ধরা পড়ল তনয়ার জিভে ক্যান্সার। ডাক্তার জিভের কিছু অংশ বাদ দিয়ে নাকে নল ঢুকিয়ে দিলেন। কিছু মাস নল দিয়ে শুধু তরল খাবারই খেতে পারবে তনয়া। আদৌ কথা বলতে পারবে কিনা তাও ডাক্তাররা সঠিক বলতে পারলেন না।

তমাল পড়ল মহা বিপদে। তনয়া রোজগার করত প্রচুর। তমালের প্রাইভেট ফার্মের চাকরি, খুব বেশি রোজগার নয়। এদিকে অপারেশনেও প্রচুর খরচ হয়ে গেছে। তার ওপর সব খাবার পেস্ট করে তরল করে নাকের নল দিয়ে তনয়াকে খাওয়ানোর জন্য রাতদিনের আয়া রাখা হয়েছে। ড্রাইভারকেও রাখা আর সম্ভব হয়নি, কেইবা ছেলেকে স্কুলে দিয়ে-নিয়ে আসবে এখন! উপায়ান্তর না দেখে তমাল বৃদ্ধাশ্রম থেকে বাবা-মাকে নিয়ে এল। শাশুড়ি-মায়ের অক্লান্ত সেবায় তনয়া ক্রমশই সেরে উঠতে লাগল।দাদুর শিক্ষায়-সাহচর্যে আদরের নাতি সমস্ত একাকিত্ব ভুলে খুশিতে প্লাবিত হতে থাকল। বৃদ্ধরা যে বাড়তি নয়, তাদেরও যে সংসারে গুরুত্ব আছে, সেকথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল তনয়া-তমাল।

বাসস্টপের সেই প্রেম

- প্রদীপ কুমার দে

ফেলে আসা সেই সব দিনে
বাসস্টপের সাদা-কালো মুহূর্তগুলো আজও রঙিন,
আজও প্রাণবন্ত।
শহর যখন আলসে দুপুরে ভাতঘুমে আচ্ছন্ন,
তুমি আমি তখন প্রজাপতি পাখার রঙ মেখে
অচেনা মেঠোপথ চিনে নিচ্ছি।
স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দুপুরের বয়স ক্রমশ বাড়ছে।
ভ্রুক্ষেপ নেই -
পায়ের তলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে
সময়ের শিষধ্বনি।
জোনাকির আলো বন্দক রেখে
তোমার নরম হাতে সবটুকু আদর মেখে,
ফিরে আসি বাসস্টপে;
আদিম শূন্যতা রেখে শেষ বাস চলে গেছে।

বন্যা

- রূপশঙ্কর আচার্য্য

জন্ম নিল বর্ষাকালে নাম দিলাম বন্যা।
রূপে না গুনে অতুলনীয়া কন্যা।।

অভাবী পিতার ঘরে জন্ম নিলো।

প্রতিবেশীদের সাহায্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পেলো।।

প্রতিবেশীরা ডাকলে পরে এগিয়ে যেত সে।
বিপদ দেখলে তখনই যেত সাহায্যতে।।

ধীরে ধীরে বড়ো হলো শহরের বিদ্যালয়,
পড়বে কি করে অর্থ নেই পিতাকে বলে না ভয়ে।।

খবর পেয়ে প্রতিবেশী এক কাকু শহরে নিয়ে গেলো।

বলল এতো কষ্টে ওকে বড়ো করে শিক্ষাকে কি করে জলে ফেলো।।
পড়াশোনায় মন দিল কঠিনভাবে বন্যা।
একটি মুহূর্ত তার চোখে নেই বিষণ্ণতা আর কান্না।।
কেটে গেলো কয়েক মাস।
বন্যা দিল খুব ভালো পাশ।।
দুদিনের বর্ষায় প্লাবিত বৃষ্টির জল।
পুকুর, ডোবা করছে টলমল।।

কে যেন ভেসে যায়? নামেনি কেউ,
শুধু বাঁচাও বাঁচাও শব্দের ঢেউ।।

বাঁচলো সে,বাঁচালো যে(বন্যা) সে যে ভেসে যায়।।

আপাদমস্তক প্রেম

- শেখ আব্বাস উদ্দিন

তোমার প্রেমের আলোয় ভিজব বলে জন্মেছিলাম আমি
যেভাবে ফাগুনের নিঃশব্দ ছোঁয়ায়
পাতাহীন বৃক্ষরাজি ভরে যায় যৌবন চিহ্নে,
সারা অঙ্গ হেসে ওঠে ওদের।
অগাধ প্রেমে দুটি পাখি ঠোঁটে ঠোঁট রাখে ।
নতুনের স্পর্শে পুষে রাখা
পুরাতন সব সংকোচ কেটে যায় অভ্যাসে পরিণত
যেভাবে সবকিছু চলতে থাকে ঘড়ির হৃৎপিন্ডে পা রেখে
সাতদিনের নিম্নচাপ কেটে গেলে একদিন চনমনে আকাশ

কোন খিদে নেই তখন শুধু তোমাকে ছোঁয়ার
একটু নির্জনতা আর তুমি আর কিছু নয়

সকাল দুপুর রাত্রি কিংবা সারাটা সন্ধ্যে বেলা
দুচোখে কামনার নদী
তুমি তো ভরা যৌবনের দূরন্ত ঘূর্ণি তখন
তোমার আশ্লেষ আমার কামনা
সে এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার এর মত রোমাঞ্চ
তারপর কোন একদিন ঘুঘু ডাকা উদাস দুপুর
আমি নেই তুমি কিংবা তুমি নেই আমি
চোখের কোনায় দু কূল ছাপানো নদী
শোকে ব্যথায়
উদ্ভাসিত বেদনার পাহাড় ।

ভক্তি দিও

- সুজন দাশ

রাম তোমারে স্বয়ং পূজে
অসুর রূপী রাবণ বধে,
মুন্ডুমালা পড়লে গলে,
হত্যা করে অসুর দলে!
শক্তি দিও শক্তিহীনে
থাকতে মতি ঐ শ্রীপদে।

এলোকেশে ভুলাও শিবে
শান্তি ফিরাও মৈর্ত্যধামে,
কৃপাণ হস্তে অট্ট হাসো!
বিঘ্ন বাধা দুঃখ নাশো।
দূর্গতি রূপ অসুর বধে
প্রচার তোমার দূর্গা নামে।

জগদ্ধাত্রী শিবা তাঁরা
ভবানী আর কালি রুপে,
পার্বতী জয়া মাতঙ্গী সতী,
ভাব্যা নিত্যা সদাগতি।
সত্যানন্দ স্বরুপিনী বিরাজ
কর প্রাণের কুপে।

মুখোমুখি

- আবদুস সালাম

আকাশের বুকে মেঘ বারবার জমে
প্রান্ত বরাবর তার আবেদন
বাঁকে বাঁকে জমে আছে ক্ষয়
প্রতিটি স্টেশনে ভরে নিই জ্বালানি
মুঠোবন্দী পতন পতাকা ওড়ায়
ফিরে আসি সংসারের টানে
চুমুতে চুমুতে ভরে দিই উঠোন
অপ্রতিরোধ্য মনন
মন্থনে মন্থনে উঠে আসে গরল
সহবাস কথা মেনে সংসারান্ত উতল হাওয়া
নক্ষত্রের গায়ে লিখে রাখি গোলাপী ব্যাথা
পরতে পরতে বাঁধা পাস ফেলের উপাখ্যান
প্রবাহিত যমুনায় ভাসছে চাঁদের নূপুর
লোকেরা পালা করে গাইছে মৃত্যুর গান
খুচরো খুচরো অবক্ষয় আর দুঃস্বপ্নের সিলেবাস
অলিখিত জীবন জন্মের আগেই মরে যায়
মৃত্যুগহ্বর থেকে উঠে আসে চাওয়া পাওয়ার অনুরোধ
পেছনের দরজায় ধ্বনিত হয় কীটদ্রষ্ট গোপন অভিসার
চাঁদের মাটিতে জোয়ার এলে আবার মিশে যায় সীমাহীন অভিমানে।

সম্মোহন

- আবদুস সালাম

খোলা আকাশের নীচে গুনছি তারাদের ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি, ভাইরাস জর্জরিত বৈশাখ উদযাপন করছে অবক্ষয়।অবশ্যম্ভাবী সতর্কতা চেটে নিচ্ছে জীবনের ঘ্রাণ,শুকোচ্ছে টবের ফুল গাছ। মুখোশ হীন শিশু শুয়ে আছে ফুটপাতে।খাঁ খাঁ দুপুর মেলে দিয়েছে বৈশাখ, বৃষ্টিহীন সতর্কতা জারি করেছে আকাশ।
দলে দলে ছুটে আসছে বিপন্ন প্রতিকূলতা। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে কল্লোল। প্রতিকূলতা কেড়ে নিচ্ছে আত্মজৈবনিক অধিকার, সময়ের বিপন্নতা গিলে নিচ্ছে সভ্যতার মূল্যবোধ। অজানা আশঙ্কায় গুনছি প্রহর। বিশ্বাসের আড়ালে অবিশ্বাস ছুরি তে দিচ্ছে শান, প্রতি নিয়ত আমরা জবায় হয়ে চলেছি
নিঃসঙ্গতা ঢেকে দিচ্ছে মহাকালের বিজ্ঞাপন।

অদ্বিতীয়

- অদিতি ঘোষদস্তিদার

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসতে গিয়েই চমকে গেলেন রবীনবাবু! আরে! স্বপ্না না? সেই লম্বা বিনুনি, একটু দোলনচালে হাঁটা, কাঁধে কালো ব্যাগ, আর ওই ওই...
নিজের মনেই হাসলেন রবীনবাবু! স্বপ্নাকে চিনতে এতো বছর পরে কি অতকিছু লাগে?
কিন্তু এই সন্ধ্যের মুখে গড়িয়ার গলিতে স্বপ্না কেন?
চা খাওয়া মাথায় উঠল। পিছু নিলেন রবীনবাবু।
পেছন থেকে সনৎ আর বিমল চিৎকার করে ডাকল, "ও রবীনদা, কোথায় চললে?"
"চা বলো, আসছি!"

হাঁটতে হাঁটতে রবীনবাবুর মাথায় কিলবিল করছে চিন্তা।
তিনি নিজেও এদিকে এই প্রথম । ব্যাংক তাদের তিনজনকে পাঠিয়েছে কিছু কাজে।
গলি থেকে বেরিয়ে এবার বড়রাস্তার মোড়ে পৌঁছতে দেখলেন বিশাল লম্বা অটোর লাইনের শেষে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না! মাথায় ফুলের মালা স্বপ্নার! কই আগে তো কখনও! তবে কি বিশেষ কারুর জন্যে এই সাজগোজ! শাড়িটাও তো বিস্তর দামি! এই ক'দিন আগেই তো কিনে দিলেন 'শর্মিলা' বুটিক থেকে!

এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে টানতেই বুঝলেন মারাত্মক ভুলটা! স্বপ্না নয়! নিমেষে চারদিকটা রণক্ষেত্র। মহিলা তড়পাচ্ছেন। সঙ্গে উত্তেজিত জনতা।
"লজ্জা করে না, বয়েস তো কম হলো না!"
"দু চার ঘা পিঠে পড়লে রস ছুটে যাবে বুড়োর!"

ভেসে আসছে কথার তীর।
অসহায় রবীনবাবু গলগল করে ঘামতে লাগলেন!
হঠাৎ কানে এল সনৎ আর বিমলের গলা।
"কি হয়েছে রবীনদা! সরুন সরুন তো দেখি!"
ষণ্ডা চেহারা বিমল আর সনৎকে দেখে একটু থমকে গেল সোচ্চার জনগণ!
রবীন কাঁদো কাঁদো।

"আমি ভেবেছিলাম উনি আমার স্ত্রী স্বপ্না! পেছন থেকে ওরকমই লাগছিল! একদম সিওর হয়েছিলাম শাড়িটা দেখে! বুটিকের শাড়ি! একগাদা দাম নিয়েছিল! বলেছিলো ভূভারতে একপিস! কিন্তু এখন তো দেখছি..."
কথা শেষ হতে না হতেই জমা জনতাকে অবাক করে দিয়ে এবার ডুকরে কেঁদে উঠল সেই মহিলাটি, "আমার শাড়িটার ডুপ্লিকেট আছে! এ বাবা!"

অনু

- দেবানন্দ দে

বেলতলা পাড়ার মেয়ে অনু। ষোল ফিটের রাস্তা ঘিরে নতুন পাড়াটি গড়ে উঠেছে। ইঁট, কাঠ, পাথরে ভরে গিয়েছে পাড়াটি। প্রায় বাড়িতেই কিশোর, বাচ্চার সমারোহ। তবে অনু ভয়ঙ্কর চঞ্চল। কেউই ওর সাথে মুখ নাড়তে যায় না। সবাই যেমন ভালোবাসে তেমনই ভয় পায়। সেদিন তো পল্লমীর সাথে সে কী ঝগড়া। অনু শাপ দিল,- মুখ পোড়া কোথাকার, যা তোর সাথে আড়ি। কী কান্ড! কী কান্ড! সত্যি সত্যিই গরম দুধ পান করতে গিয়ে পল্লমী মুখ পুড়িয়ে বসল। এই'তো তিন দিন আগে পাড়ার ঘোৎকা রেগে গিয়ে মারল এক ধাক্কা। ধাক্কা খেয়ে অনু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে অনু বলে বসল,- তোর হাতে খুব জোর তাই না? দেখবি, হাত ভেঙ্গে শুয়ে থাকবি বিছানায়। কী আশ্চর্য! ঠিক তাই হলো, ফুটবল মাঠ থেকে হাত ভেঙ্গে বাড়ি ফিরল। মেয়েটা কী বাবা! এতো শাপ-শাপান্ত করে কেন? যা বলে তাই ফলে যায়।

সৌদামনির বিয়ে ঠিক করতে ওর বাবা, মা উঠে, পড়ে লেগেছেন। সৌদামনির শ্বশুর বাড়ি নিয়ে খুব ভয়। বরটা পাজি হবে নাতো? এই সব চিন্তা করেই সে অনুর কাছে চলে গেল। বললো,- আমার বরটা যেন ভালো হয় রে। অনু কথা শুনে তো থ! তোর বিয়ে? যা, তোর বর ভালো হবে।

সত্যিই সৌদামনির বর, ঘর ভালো হয়েছিল।

কাবুলিওয়ালার দেশ

- অনিন্দ্য ঘোষ

ত্রস্ত জীবন, মানবতার নেইতো কোনো লেশ,
কাবুলিওয়ালা কেমন আছ তুমি?
কেমন আছে তোমার সাধের দেশ?
ছুটছে সবাই প্রাণের তাগিদ আকঁড়ে করে বুকে,
রক্তের নদী স্রোতস্বিনী, এখনো কি তুমি সুখে
দিনযাপনের আশায় বাঁচছো?
এখনো কি তোমার দুচোখ সুখস্বপ্নেতে বিভোর?
কাবুলিওয়ালা তোমার দেশে যে এখন গভীর রাত, কবে যে
আসবে ভোর
না জানলেও, অপেক্ষাতে গুনছে প্রহর,
অগুনতি মানুষ আর ফেলে আসা ঘর,
বন্দর জুড়ে দেখো মানুষের ঢল,
প্রাণের তাগিদের মাঝে মৃত্যুর কোলাহল,
কাবুলিওয়ালা তুমিও কি হারিয়ে গেলে
অনন্ত এই বেদনার মিছিলে . . . ?
এই অনন্ত বেদনার আদৌ কি আছে কোনো শেষ?
কাবুলিওয়ালা কেমন আছ তুমি . . . ?
কেমন আছে তোমার সাধের দেশ . . . ?

দশভূজা

- অনিন্দ্য ঘোষ

সবাই তোকে পাগলী ভাবে
তুই যে মহামায়া,
পদতলে বিশ্বভুবন
জগৎ যে তোর ছায়া,

তোর চাওয়াতেই সূর্য ওঠে
বৃষ্টি ঝরে পড়ে,
তোর হাসিটাই পাহাড় বেয়ে
ঝর্ণা হয়ে ঝরে,

তোর ক্রোধেতে ভাসে ভুবন
কখনো হয় খরা,
তুই যে আপন আঁচলতলে
রক্ষা করিস ধরা,

জগৎ যখন দেবী রূপে
করে যে তোর পূজা,
পাগলী তখন আপনরূপে
তুই যে দশভূজা ||

নিভৃতি যাপন

- রূপক ভন্জ

(১)

একাকী একান্তে নিকেল রোদের দুপুর
অবলা নুড়ি পাথরে শ্যাওলা মন্থরতায়
মাছেদের নৈঃশব্দিক আঁকি-বুঁকি খেলা
আর্ত শীতের উত্তুরে হাওয়ায়
বৃথা উত্তরীয় কথামালা
জেগে থাকা আলো আধাঁরির আদি বটমূল
এখন শুধু বিরহের নিভৃতি যাপন।।

(২)

জলজ আকাশে সান্দ্রতা ভাঙা বৃষ্টি মেঘ
কচু পাতায়-মুক্তো টলমল
বাড়ির চিলেকোঠার কাঁচ জানলায়
বৃষ্টিকণা পেতেছে সীসার অন্তর্বাস
জলপিপিদের সাথে তোমার জল শরীর
পালকের আস্তরণ নাভিতটে-মুক্তো লেগে সে সব।
আনন্দের সিক্ত আবেশে শালুক ফুল নিয়ে
প্রেমিকা শেষ কবে দেখেছে এ শহর?
পাকদন্ডীর পথ ঘুরে আজ বত্রিশ বছর।

ডুব

- অঙ্কুরিতা দে

ডুবতে জানতে হয়, ডুবতে।
কোথায় ডুববে তার ফারাক করতে জানতে হয়।
এই যে তোমার মুঠোয় জমানো আয়না,
তাতে ডুব দিয়ে দেখো কেমন দিব্য দৃষ্টি পাও!
সেই যে তোমার তোরঙ্গে জমানো পাপের আখ্যান,
সেই যে তোমার জ্বলন্ত তীরের চাহনিতে ঘায়েল হওয়া
কিশোরী হরিণীর পথ ভুল করা,
সেই যে তোমার ইচ্ছে করে স্বপ্নের পাহাড় সাজিয়ে
তাকে পাশ কাটিয়ে জলকাদায় দাপাদাপি,
সবটা নিজেই কেমন দেখতে পারবে!
সারি সারি ক্ষতের মতো।
তবু বিলম্বিত প্রলয়ের মতো যখন আফ্রোদিতি এসে
দাঁড়াবে তোমার সামনে,
তখন দাঁত-নখ খসিয়ে একটু নাহয় সহজ মানুষ হয়ে যেও।
একটু নাহয় প্রেম-সাগরে ডুব দিও, অ্যাডোনিস।

এক দেশদ্রোহী কবি

- সঞ্জীবন সিংহ মহাপাত্র

এক কবি ছিল পাগল গোছের, যে সারা দিন শব্দ খুজে বেড়াত।
গাছ,পাখি,ফুল, পাতা,মানুষ যা পেত তা নিয়েই লিখত।
কবির লেখায় ফুটে উঠতে লাগল সমাজ,রাজনীতি, ধর্মের কথা।
আসতে থাকল অভিযোগ, বলা হলো এ কবিতা নাকি অসামাজিক।
কবির শাস্তির দাবিতে মিছিল বেরোল।
ধার্মিকরা বললেন,' ধর্ম নিয়ে কবিতা লেখা যায় না'।
রাজনীতিকরা বললেন,' বিরোধীদের চক্রান্ত'।
আর বুদ্ধিজীবীরা বললেন, 'আঁতেল'।
আর মানুষ বলে উঠলো- ঠিক, ঠিক, ঠিক।
সবাই একসাথে বলে উঠল কবি দেশদ্রোহী,
আর দেশদ্রোহিতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।
কবিকে তোলা হলো কাঠগড়ায়, জিজ্ঞেস করা হলো এসব লেখার মানে কি?
কবি উত্তর দিল আমি যা দেখি তাই লেখি, আর যা ভাবি তাই বলি।
কবির বলার মুখ আর দেখার চোখ দুইই বেঁধে ফেলা হলো।
আর হাতের থেকে কলম ছাড়িয়ে,
ধরিয়ে দেওয়া হল ধর্মের ধ্বজা ও রাজনৈতিক পতাকা।
এখন কবি আর কিছু দেখে না,কিছু বলে না।
সে শুধু শ্লোগান দেয়,মিছিলে পা মেলায়,
জোরে জোরে চিৎকার করে বলে,
কবিতায় যারা ধর্মের কথা বলে তারা অধার্মিক,
কবিতায় যারা রাজনীতির কথা বলে তারা দেশদ্রোহী,
আর দেশদ্রোহিতার অর্থ হলো মৃত্যু।

শরণার্থী

- দীপঙ্কর সাহা

ছোটবেলায় যে বাড়িতে আমার লালনপালন
সে বাড়ির নামটি ছিলো অরবিন্দ নিকেতন
লোকে বলতো বাগচীদার বাড়ি। শুনে বুকটা
ফুলে উঠতো বৈকি। এখানে আমি একটা
কথা বলি, বাবার নাম শুনে কেউ চমকায় ?
চমকাতাম, বর যখন আমার বাড়ি যায়,
বলে তোমার বাপের বাড়ি আমার বাড়ি নয়।
শুধুই বাপের বাড়ি! আমার বাড়ি কেহ নাহি কয়।
বিয়ের পর যে বাড়িতে আমার বসবাস,
নাম তার শ্বশুরবাড়ি। ভুলে যাবার নেই অবকাশ।
শ্বশুরমশাই গত হয়েছেন, তবু নাম তার
বদলায় নি। থাকি আমি আর আমার বর।
যদি আমি থাকতাম হেথা একমাত্র একা
শ্বশুর ঘরই বলতো লোকে অদৃষ্টের লেখা।
ছেলে বড় হয়েছে, থাকে হায়দ্রাবাদে
বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে।
চলে যাই "ছেলের বাড়ি", যখন স্বামী গত হয়।
তাহলে আমার কি নেই কোনও পরিচয়?

অনন্য উপহার

- শুভ্রা ভট্টাচার্য

টিভির পর্দায় বার বার ভেসে উঠছে রাইমার জন্মদিনের কেক কাটার ছবি। লক্ষ লক্ষ মানুষের আশিস আবেগ ভালবাসায় আপ্লুত আনন্দিত অভিভূত সে। স্টুডিওতে বসে কেকটা কাটতে কাটতে ভাবছে,"সে কি বাস্তবের মাটিতে নাকি স্বপ্নে!এও তার প্রাপ্তি ছিল জীবনে!" আজ তার ছোটবেলায় মায়ের মুখ থেকে শোনা সেই অমরবাণীটি বারবার মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠছে। বন্ধুদের জন্মদিন কত ধুমধাম করে পালিত হয়, কত উপহার পায় তারা। কিন্তু তার তো কোনোদিন জন্মদিন পালিত হয়নি, কোনো দামী উপহারও তো কোনোদিন মা কিনে দেয়নি। কখনও কারণ জানতে চাইলে মা বলেছে "এমন জীবন করিও গঠন, অন্যের দ্বারা হোক জন্মদিন পালন"।

আজ ১০ই মে রাইমার শুভ জন্মদিন ও মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট আউট। পড়াশোনায় ছোট থেকেই বরাবর খুব ভাল হলেও সকাল থেকে বেশ উৎকণ্ঠায় আছে, না জানি কেমন রেজাল্ট হবে! বাড়িতে টিভি না থাকায় মাসীর ফোনেই প্রথম জানতে পারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে রাজ্যে পঞ্চম হয়েছে। এ যেন তার জীবনের অতুলনীয় অবিশ্বাস্য প্রাপ্তিতে ভরা সোনামাখা জন্মদিন। তারপর আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়নি তারা। বাড়ির সামনে লাইন দিয়ে রিপোর্টার, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের উপচানো ভিড়।

রিপোর্টারদের তাকে নিয়ে ইন্টারভিউ এর প্রতিযোগিতা। এরপর নিজের স্কুল ঘুরে সাদর আড়ম্বরে সোজা কলকাতা টিভি চ্যানেলে। সেখানে টিভিতে ইন্টারভিউ চলাকালীন যখন তারা জানতে পারে যে সে তার জন্মদিনে নিজেকে ও বাড়ির সবাইকে জীবনের সেরা উপহারটি তুলে দিয়েছে, তখন অন্যান্য মেধা তালিকার বন্ধুদের সাথে টিভিতে শুরু হয় মহা সমারোহে তার জন্মদিন পালন। দর্শকেরাও এই অনন্য জন্মদিনকে খুব খুশিতে উপভোগ করতে লাগলো। মা ও মেয়ের সম্মিলিত সংগ্রামী জীবনযুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে সর্বোত্তম উপহারে আজ তারা ভূষিত। রাইমার মেধার আলোয় আলোকিত সমগ্র রাজ্য। জীবনের কত অব্যক্ত ব্যথা বেদনা অপমান অসম্মান আজ যেন এমন স্বর্ণ-উপহারের মধুর পরশে আনন্দ অশ্রুধারায় প্লাবিত হয়ে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।।

নিঃশর্ত

- পিকু হালদার

তোমার প্রেমের
প্রেরণায়
প্রাণও পণ,

নিয়ত,
নজরানাও
নজিরবিহীন।

তবু সংশয়
রোজ দংশায়
হৃদয়ের জলবায়ু

দাও দিনরাত
অভিসম্পাত
পাথরের পরমায়ু।

দাও অনন্তে
রোজ অজান্তেই
সযত্নে নির্বাসন

আমার কফিনের
নিঃশর্ত কাফনে
সবই-তো শোভন।

https://www.shabdodweep.co.in

খেলা

- পিকু হালদার

আজকাল বড় ভয় পাই গতানুগতিকে,
পারস্পরিক বাস্তুতন্ত্রে অস্তিত্বের দায়ভার বড়ই ভারী...
যদি ভিড়ে মিশে যেতে চাই, নামতেই পারি অংশীদারির পথে
সে-পথের মাইল-ফলকে লাভ-ক্ষতির হিসেব সারি সারি

এ এক অস্থির সময়, হে প্রিয়...
সকলেই জিততে চায়, সকলের হাতেই তরবারি...

এও এক অনিবার্য খেলা, আমি, তুমি, সকলেই খেলি
যুদ্ধং দেহী প্রতিদিন প্রাণপণ, তুমিও, আমিও !
কে কার আগে যাব, কিভাবে হারাবো, ভেবেই চলি
আসলে ভয় হয় তুমিও তো জিতে যেতে পারো !

আমার জেতা অর্থহীন হয়ে যায়, হে প্রিয়...
যদি খেলাশেষে তুমি-ই না হারো ।

কিছু ভালোবাসা দূরত্বে বাঁচে

- শুভ্রা আচার্য্য

আকাশের বুক থেকে ঝরা মুক্তোর জল
টুপ করে ঝরে যাবে পলকের হিসাবে
অপেক্ষা ধূলিসাৎ করে ;
আঁকড়ে ধরার তাই চেষ্টারা বৃথা হাঁটে
পদ্মপাতায়।
দূর থেকে দূরত্ব মাপজোক,
অমোঘ কাছটান উচাটন।
জানলার পরবাসে ঘনঘটা রাত আর
দেওয়ালের চার ভাঁজে যন্ত্রনা যাপন ;
অশ্রুর প্রলেপনে বেঁচে থাকা ভালোবাসা
গুনিতকে সুদসহ বাড়ে ।
কখনও বা ছুঁতে পাওয়া শিউলির কমলায়
অনুরাগে মিশে যাবে শিশিরের শিহরণ ;
বুকজাগা আশা হাত ধরে রাখে ভালোবেসে,
দূরত্ব রাত জাগে, দিন গোণে,
দিন পার করে।

অজেয় আবেগে

- শুভ্রা আচার্য্য

অনুভূতির আবক্ষ স্নানে স্নাত আমায়,
যখন তুমি ছোঁওনি আমার অনামিকা কনিষ্ঠাও,
হৃদয় মন্থিত ভালোবাসায়
আমার ধমনী বাহিত তুমি।
আজন্ম আবেগের মুখে
পাহাড়ি ঝর্ণা হয়ে ঝরতে থাকে
শব্দের মুক্তো, পান্না, চুনী।
টুপটাপ তারা ভরি
মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গীকারে,
আশৈশব দূরত্বভেদে
ভালোবাসা আসবেই জানি।

তৃষ্ণার্থ চাতক

- গৌতম তালুকদার

কলিজাটায় দাউ দাউ করে
জ্বলতে থাকে আগুন
উথাল পাথাল যন্ত্রনা যখন
আছড়ে পড়ে তখন ।

পূর্ণ শশী আত্মহংকারে
ঢেকে থাকে মেঘ কিংবা
পাতা'র আড়ালে।
মনে হয় দমকা হাওয়া হয়ে
তচনচ করে দিই যেখানে যত
লাল গোলাপের মিলন মেলা।

চন্দ্র গ্রাসেও ভেসে থাকি নদীর বুক জুড়ে
স্বচ্ছ সলিল আয়নায় দেখি রাহুর স্পর্ধা ।

এ সত্য মানতে-ই হয় গ্রহে'র নক্ষত্রের নিয়মে
ও যে পূনরায় যুবতী হয়ে ফিরে আসে হৃদয়ে
যেখানে হৃদপিন্ড ধুক ধুক করে আর
কাছে পাবার তৃষ্ণার্ত চাতক হয়ে।

এত রূপ এত আত্ম গরিমা আছে বলেই

কলঙ্কিনী নামে জগৎ খ্যাত;
তাই ওর প্রেমে না পড়ে উপায় কি বলো।

https://www.shabdodweep.co.in

দুগ্গা দুগ্গা

- পিয়ালী গাঙ্গুলী

অফিস থেকে বাড়ি, মাত্র দশ কিলোমিটার দূরত্ব। সেইটুকু আসতেই এই সপ্তমীর সন্ধ্যেতে দু ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। ক্লাচ ব্রেক, ক্লাচ ব্রেক করতে করতে পা দুটো যেন ব্যথা হয়ে গেল। তারপর বাড়ির সামনে এসে সেই এক জিনিস। ঠাকুর দেখতে এসে লোকজন ঠিক ওদের গেটের সামনে গাড়ি, বাইক পার্ক করে দিয়ে চলে যায়। প্রতিবার এই সমস্যা। বাড়ির চারপাশে তিনটে প্রাইজ পাওয়া পুজো, তাই মানুষের ঢল লেগেই থাকে। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে গাড়ি ঢোকাতে পারল অরিক। গাড়ি থেকে নেমেই তেড়ে গালাগাল দিল সিক্যুরিটিকে "আপনারা আছেন কিসের জন্য? লোকে গেটের সামনে পার্ক করে দিয়ে চলে যায়, আপনারা দেখতে পারেন না?" সিগারেটটা ফেলে ওপরে উঠতে যাবে, দেখল অনুপ হাসিহাসি মুখে বেরোচ্ছে। "কী রে অনুপ, আসার সময় দেখলাম তোর দোকানে তো ভিড় উপচে পড়ছে, তুই এখানে কী করছিস?" "ওই একটু খাবার দিতে এসেছিলাম", বলে অনুপ বেরিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকতেই পিকু লাফাতে লাফাতে এল "বাবা চিলি ফিশটা কী ভালো, আর একটুও ঝাল নেই।" জুতো খুলতে খুলতে অরিক জিজ্ঞেস করল "মা বানিয়েছে না কি সুইগি করে?" "উহু, মাও না, সুইগিও না। অনুপকাকু। বলেছে আমার জন্য স্পেশালি বানিয়েছে, একদম ঝাল ছাড়া।" পেছন থকে পৌষালী বলল "আর বলে গেছে দাদাকে বলবেন বাসা নয়, পিওর ভেটকি। তুমি ফ্রেশ হয়ে এসো, আমি গরম করছি।" টেবিলের দিকে তাকিয়ে অরিক বলল "এতগুলো প্যাকেট কীসের?"

মাইক্রোওয়েভে ঢোকাতে ঢোকাতে পৌষালী উত্তর দিল "আরে শুধু কী চিলি ফিশ, নুডলস, ফিশ ফ্রাই, ললিপপ এসবও আছে। কতবার বললাম জানো, কিছুতেই টাকা নিল না। বলল দাদা যা করল আমাদের জন্য"।

অরিক এমপ্লয়ি ডিসকাউন্ট দিয়ে ব্যবস্থা না করে দিলে অত দামী হিয়ারিং ইমপ্লান্ট ওদের পক্ষে কোনোদিন কেনা সম্ভব হত না। ক্লাব আর পাড়ার লোকজনও অবশ্য অনেকটা সাহায্য করেছে। অরিক একটি বহুজাতিক সংস্থার রিজিওনাল হেড। ওদের কোম্পানির মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। ওদের প্রোডাক্টের দাম অবশ্য বেশ চড়া। অনুপের ছেলেটা জন্ম থেকেই কানে শুনতে পেত না। সমস্যাটা এতটাই জটিল যে সাধারণ চিকিৎসায় কোনো উপকার হয় নি আর ডাক্তারবাবুরা যে মেশিন লাগাতে বলেছেন তার প্রায় লাখখানেক টাকা দাম। কথাটা জানতে পেরে অনুপকে কিছু না বলে ডিটেলসগুলো নিয়ে নিজের অফিসে কথাবার্তা বলে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল অরিক। প্রথম ট্রায়ালের দিন নিজে সঙ্গে করে নিয়েও গেছিল ওদের। ছেলেটি এখন শুনে শুনে একটু একটু কথা বলতে শিখেছে। পাড়ার প্যান্ডেলে ঢাকের তালে নাচতে নাচতে আজ মুখ থেকে বেরিয়েছে "দুগ্গা"।

জীবনের গল্প

- মৌমিতা দত্ত

আমরা নিজেরাই এক একটা গল্পের চরিত্র।
জীবন ও তার লেখক আর নদী তার কলম।
নরমে-গরমে ,প্রলোভনে -অত্যাচারে,
ভালোবাসায়-মন্দবাসায়,
আমরা কেবলই এক-একটা আঁচড়।
তবুও আমরা বোকার মতন,
গল্পে ডুবি, গল্পে ভাসি -
গল্পে খুঁজি রসদ।।

তুমি

- মৌমিতা দত্ত

জানি, এখন তোমার ভাত ডালের জীবন।
নুন এর আধিক্য বা সমতায় -
প্রেমের পারাদ ওঠানামা করে ;
তোমার শরীরে ও মনে।
সাজিয়ে দেওয়া মেকআপে তুমি আজ মোহময়ী।
অথচ একদিন খোলা চুল আর একটু কাজলেই
যে কোনো সুন্দরীর আলো নিভিয়ে দিতে ওস্তাদ ছিলে।

ধ্রুবক

- প্রিয়াঙ্কা ভুঁইয়া

কিছু কবিতা যেন বেড়ে ওঠে অনুভূতি হয়ে -
ফেলে আসা মুহূর্তকে পেঁচিয়ে রাখে অনুভবে,
জড়িয়ে থাকে নিভৃতে আত্মার সত্তা ঘিরে;
দীর্ঘ যাপনের আবহমান জুড়ে আগলে রাখা আখর,
সময়ের গ্যাসবেলুন উড়ে গেছে আজ বহুদিন!
তবু অনেক দিনের পরে আবারও ওঠে প্রতিধ্বনি -
দূরের সাঁকো, কৃষ্ণচূড়া রঙ, নীলচে বিকেল,
স্মৃতির তাক থেকে সহসা পড়ে যায় ওরা!
নির্বাক থাকার লড়াইয়ে হার মেনেছে পুরোনো কথারা,
শব্দেরা বেঁচে আজও ধুলো জমা খাতার ভাঁজে,
নানা অজুহাতে দিনের পর দিন ঝুল-আবেগ একাকার!
প্রতি কিনারে জমে আছে গাফিলতি;
কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো কলরব নেই শব্দদের,
আমি জানি না, ওদেরকে কি এপিটাফ বলা চলে?
এগোয় সময়, ভিতরে-বাইরে বৈচিত্র্যময় রদবদল,
তবু ডাক আসে অনেক দিনের পরে আবারও!
ব্যস্ততার নিষিদ্ধতায় থমকে ছিল যে হারানো সফর,
সেই মহাসড়কের পথটা আবার খুলে যায় হঠাৎই!
চেয়ে দেখি হারায়নি কিছুই, রয়ে গেছে সবটাই,
ঝরে যাওয়া তো থেকে যাওয়ারই পাকাপাকি অভ্যেস!
অনেক দিনের পর মুখোমুখি খুঁজে পাওয়া সেই অস্তিত্ব -
আজও অবিকল, রদবদলহীন, সর্বপ্রাচীন!

https://www.shabdodweep.co.in

অচেনা স্থাপত্য

- সৌমেন পাল

সেই কোন প্রাচীন থেকে আমি বিরাজমান,
ক্লান্তিহীন,আর্তনাদহীন,কলরবহীন।

আমি সাক্ষ্য দিয়েছি কতো ইতিহাসের,
সহেছি যন্ত্রণা ক্ষমতা লোভের।
এ শরীর কতবার ভিজেছে রক্তে
কতবার নিয়েছি ঘ্রাণ বারুদের গন্ধে।

আমি হেসেছি কিশোরীর নূপুরের ছন্দে,
হেসেছি তারুন্যের উদ্যম প্রেম নিবেদনে,
সাথী হয়েছি বালকদের লুকোচুরির,
দুঃখ পেয়েছি অভিমানী তরুণীর অভিমানে।

আজও কোনো বসন্তের পূর্নিমায়,
যখন দখিনা বাতাস ছোঁয়া দিয়ে যায়
জীর্ন শিরায় শিহরন্ জাগে,
বাকহীন অভিমানে লুকাই আত্মত্যাগে।

হারানো কৈশোর

- সৌমেন পাল

শরৎ সকালে শহরের শুকনো অলিন্দ ঘুরে
মন খুঁজে পায় শিশিরের তাজা নিঃশ্বাস।
পৃথিবীর অখ্যাত প্রান্তরে কাশের সমুদ্রে-
যেখানে কোনও জাহাজ ফেলে না নোঙ্গর,
সেখানে জলফড়িং এর মত ভেসে থাকে
ফেলে আসা রঙিন কৈশোর।

শিশির আতসে ভেসে ওঠে হারানো স্মৃতি।

ভেসে থাকা মেঘ মাঝে খুঁজি-
হারিয়ে যাওয়া আমার সপ্ন পক্ষীরাজ।
শিউলি সুবাসে,ধূলো জমা স্মৃতি খুলে দেখি-
অচেনা বালিকা হাতে সাজি,মায়াবী সাজ
কারো অপেক্ষায় এখনো দাঁড়িয়ে একাকী।
বহু দূরে বকুল গাছের নীচে
একদল বালক এখনো হয়তো বোনে-
তাজা রূপকথার ছবি।

বাস্তব আমার শহরের মত প্রানহীন।

ক্রমে ফিকে হয়ে আসে হারানো কৈশোর,
এখনো আছে কাশ,ছেঁড়া মেঘ,শিউলি সুবাস
তারা প্রানহীন, অভাবী মুক্ত অবসর।

সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।
সকলের পুজো ভালো কাটুক।

https://www.shabdodweep.co.in

শব্দদ্বীপ
ওয়েব ম্যাগাজিন
https://www.shabdodweep.co.in